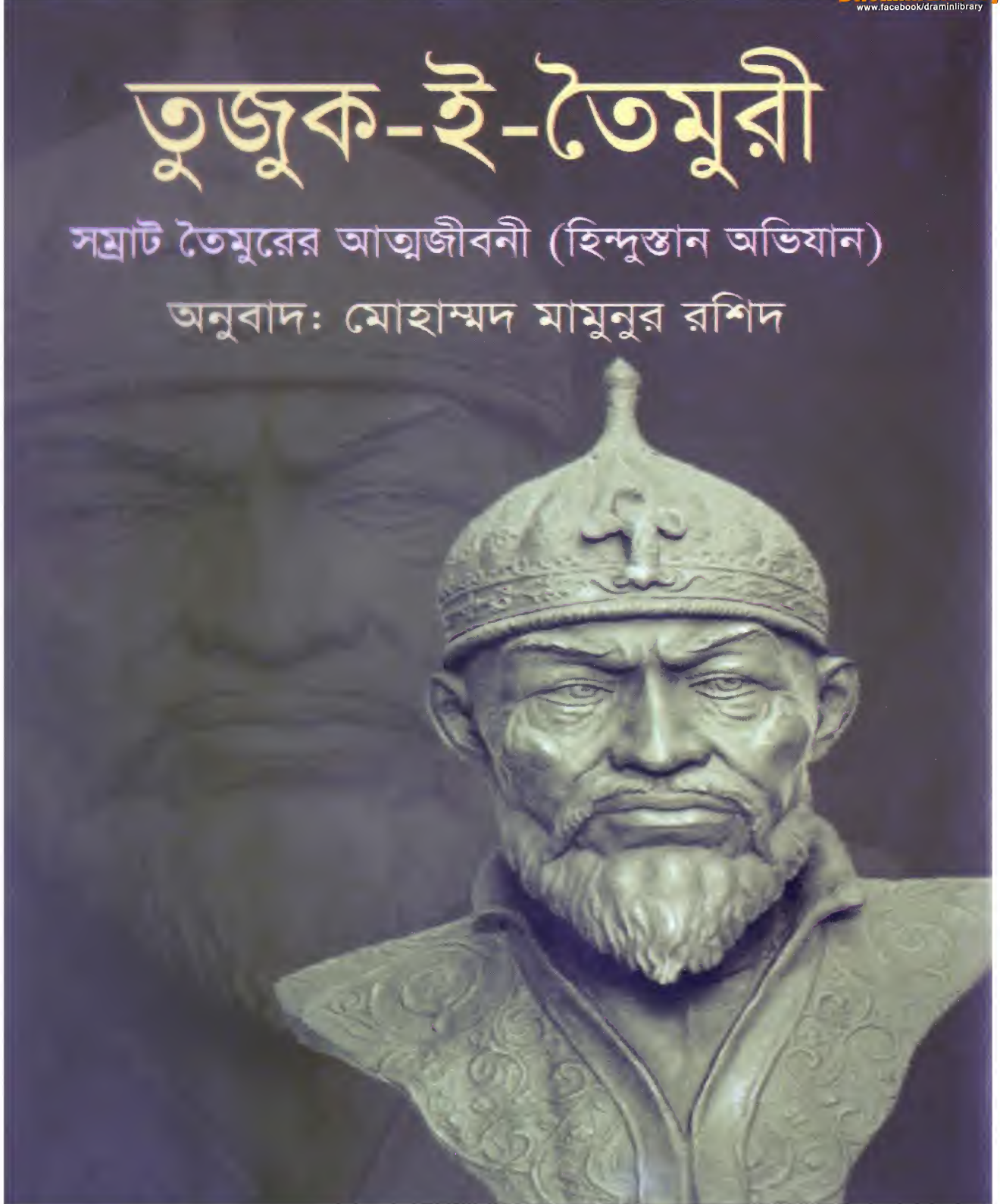


তুজুক-ই-তৈমুরী

সম্রাট তৈমুরের আত্মজীবনী (হিন্দুস্তান অভিযান)

অনুবাদ: মোহাম্মদ মামুনুর রশিদ



তুজুক-ই-তৈমুরী
সম্রাট তৈমুরের আত্মজীবনী (হিন্দুস্তান অভিযান)
অনুবাদ: মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ

প্রকাশনার তৃত্ব দশকে
ইউনেট ওয়েজ



প্রকাশক
মোহাম্মদ লিয়াকতউল্লাহ
ইউনেট ওয়েজ
লিয়াকত গ্রাঙ্গা
৯ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
দূরভাব : [+৮৮] ০২৭১২১ ৫৬৮
ই-মেইল : studentways@hotmail.com
ওয়েব : www.studentways.info

প্রথম প্রকাশ
একুশে গ্রন্থমেলা ২০১২
ফাল্গুন ১৪১৮ বঙ্গাব্দ
অনুবাদ শব্দ
মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী
অঙ্কর বিন্যাস
এস ওয়েজ কম্পিউটার
বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

মুদ্রণে
মৌমিতা প্রিন্টার্স
প্যারিদাস রোড ঢাকা ১১০০

মূল্য : একশত পঞ্চাশ টাকা

ISBN : 978-984-406-646-8

THOJUK-E-TIMURI : Biography of Empire Timur (Hinduistan Adventure) in Bengali. Translated by Mohammad Mamunur Rashid. Published by Mohammad Liaquatullah of Student Ways. 9 Banglabazar, Dhaka-1100. First Edition : Ekushe Bookfair 2012. Price : Taka One Hundred Fifty only.

উৎসর্গ

আমার বোন আফরোজা, শিরীন,
নীলু ও নার্গীস এবং
ভাই মাহমুদ ও মনসুরকে।

ভূমিকা

এটা হচ্ছে সম্রাট তৈমুর'র আত্মজীবনীমূলক স্মৃতিকথা। এই স্মৃতিকথার হিন্দুস্তান অভিযানের অংশই এই গ্রন্থে অনুবাদ করা হয়েছে। তৈমুরের নির্দেশে তৈমুরের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে বিজ্ঞ, জ্ঞানী ব্যক্তির দ্বারা এই স্মৃতিকথা লিখিত হয়েছিল। পূর্ণাঙ্গ আত্মজীবনীতে তৈমুরের সাত বছর বয়স থেকে চুয়াত্তর বছরে জীবনের শেষক্ষণ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। এমনকি সবশেষে লিখা রয়েছে, “শা'বান মাসের ১৭ তারিখ (১৪০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৯শে মার্চ) আল্লাহর নাম নেবার পর আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি এবং সর্বশক্তিমান ও মহামহিম সৃষ্টিকর্তার হাতে আমার পবিত্র আত্মা সঁপে দেই।” তাঁর নির্দেশ ছিল তাঁর জীবনের শেষ মূহুর্তের বর্ণনাও যেন তাঁর জবানীতে লিপিবদ্ধ করা হয়।

এটা চাঘতাই তুর্কী ভাষা থেকে ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করে সম্রাট শাহজাহানকে উৎসর্গ করেছিলেন আবু তালেব হোসেইনী। সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকাল শুরু হয়েছিল ১৬২৮ সালে। আবু তালেব ১৬২৮ সাল থেকে ১৬৩৭ সালের মধ্যে এটা ফার্সী ভাষায় অনুবাদ সম্পন্ন করেছিলেন। কিন্তু তৈমুরের মৃত্যুর ৩০ বছর পর তাঁর নাতি ইব্রাহীমের পৃষ্ঠপোষকতায় শরফ উদ্দিন ইয়াজদী রচিত ‘জাফর নামা’র সাথে ‘তুজুক-ই তৈমুরী’র ফার্সী অনুবাদে বেশ কিছু তথ্যগত গড়মিল দেখতে পেয়ে সম্রাট শাহজাহান এই তুজুকের ফার্সী অনুবাদ নতুন করে করিয়ে নেন। শাহজাহান তাঁর রাজত্বের ১০ম বৎসর ১৬৩৭ সালে এর নতুন অনুবাদ ও সম্পাদনার দায়িত্ব দেন মোহাম্মদ আফজাল বোখারীর উপর।

বোখারীর কৃত সেই অনুবাদ স্যার এইচ ইলিয়ট সংগ্রহ করেন। এর কিছু অংশ ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন তৎকালীন বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের সি.ই চ্যাপম্যান এবং বাকী অংশ অনুবাদ করেন প্রফেসর ডাউসন। পুরো ইংরেজী অনুবাদটি সম্পাদনা করেছেন প্রফেসর ডাউসন। ১৮৭৬ সালে এটি History of India as told by its own historians সিরিজ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। ইংরেজী ভাষার বাক্যরীতি, শব্দ চয়ন ইত্যাদী সবই হুবই বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে। যাতে তৈমুরের কথা বলার স্টাইল, তার শব্দ ও বাক্য চয়ন পাঠকরা উপলব্ধি করতে পারেন। মনে রাখতে হবে, এ গ্রন্থে তৈমুর বক্তা। তিনি দৌর্দণ্ড প্রতাপশালী সম্রাট ছিলেন। তিনি হুকুম দিতে এবং হুকুমের তাৎক্ষণিক প্রতিপালন দেখতে পছন্দ করতেন। এ গ্রন্থে তাঁর সেই মানসিকতার প্রতিফলন রয়েছে।

তৈমুর ১৩৩৬ সালের ৮ই এপ্রিল উজবেকিস্তানের শাহসিরাজের বাবলাস গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তিমুরীয় সাম্রাজ্য ও রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ১৩৭০ থেকে ১৪০৫ সাল পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য স্থায়ী হয়েছিল। আধুনিক তুরস্ক, সিরিয়া, ইরাক, কুয়েত, ইরান থেকে মধ্য এশিয়ার কাজাখস্তান, আফগানিস্তান, রাশিয়া, তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান, কিরগিজস্তান, পাকিস্তান, ভারত— এমনকি চীনের কাশগড় পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। অটোমান সাম্রাজ্যকেও তিনি ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছিলেন। তুর্কি-মোগল বীর তৈমুর ১৪০৫ সালে তাজিকিস্তানের সিরদরিয়ার অর্তারে মৃত্যুবরণ করেন। তৈমুর মুসলমান ছিলেন। তাঁর বাবার নাম ছিল তারাকি। তারাকি একজন ভূস্বামী ছিলেন। তৈমুর ১৩৯৮ সালে সিন্ধু নদী পেরিয়ে দিল্লী আক্রমণ করেন। এ সময় দিল্লীর সুলতান ছিলেন তুঘলক রাজবংশের নাসির-উদ-দীন মাহমুদ। এক দুর্ঘটনায় তৈমুরের একটি পা খোঁড়া হয়ে যায়। তাই তাঁকে ফার্সী ভাষায় তৈমুর ল্যাঙ্গ ডাকা হতো। তৈমুর ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট বাবুরের পূর্বপুরুষ। তৈমুরের মৃত্যুর পরও তাঁর সাম্রাজ্য কোনো না কোনোভাবে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে নেতৃত্বে আসীন ছিল।

বইটি অনুবাদকালে আমার ভাগ্নী তনিম নানাভাবে সহায়তা করেছে— তাকে ধন্যবাদ জানাই। বইয়ের জগতে প্রবেশ করেছি যার হাত ধরে— তিনি বাংলাদেশের সনামধন্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান স্টুডেন্ট ওয়েজএর কর্ণধার মোহাম্মদ লিয়াকতউল্লাহ। এর আগে তিনি আমার আরো দু'টি ইতিহাস সম্পর্কিত বই প্রকাশ করেছেন। এই তৃতীয় বইটিও প্রকাশ করতে তিনি সম্মতি জানিয়েছেন। সবই মহান আল্লাহর মেহেরবানি। লিয়াকত ভাইয়ের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি।

—মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ

সূচিপত্র

হিন্দুস্তানের কাফেরদের বিরুদ্ধে পবিত্র যুদ্ধ (জেহাদ)	১৭
কাফের কাটোর ও সিয়াহ-পোশদের বিরুদ্ধে	
পবিত্র যুদ্ধের বর্ণনা	১৯
শাহাবুদ্দিনের দ্বীপটি দখল	২৯
নুসরাত খোখারকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করার বিবরণ	৩৪
মুলতান বিজয়ের খবর আসার বিবরণ	৩৬
শাহজাদা পীর মোহাম্মদের সৈন্যবাহিনীতে	
আমার ৩০ হাজার অশ্ব উপহার দেয়ার বিবরণ	৩৯
ভাটনিরের নগরদুর্গ দখলের বিবরণ	৪০
ভাটনির অবরোধ	৪২
সরস্বতি শহর বিজয়	৪৭
দিল্লী জয়ের প্রস্তুতি	৫০
দিল্লী আক্রমণ করার বিষয়ে যুদ্ধ পরিষদ	৫৩
যুদ্ধের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে রাজপুত্র ও আমীরদেরকে	
নির্দেশনা দেন তৈমুর	৫৫
এক লাখ হিন্দুকে নির্বিচারে হত্যা	৫৬
দিল্লীর সুলতান মাহমুদের পরাজয়	৫৯
দিল্লী নগরী লুণ্ঠন	৬৬
দিল্লী জয়ের পর কাফেরদের বিরুদ্ধে অভিযান	৭০
মিরাট দখল	৭২
গঙ্গায় যুদ্ধ	৭৪
একদিনে তিনটি বড় বড় বিজয়	৭৭
সিওয়ালিক পার্বত্যাঞ্চলে বিজয়	৮৩
সিওয়ালিক বিজয়	৮৫
নাগরকোট (কাজরা) দখল	৮৮
জম্মু জয়	৯২
কাশ্মীরের বাদশাহ ইস্কান্দার	৯৪
তৈমুর একটি দরবার বসান	৯৯
গণ্ডার ইত্যাদী শিকার	৯৯
কাশ্মীরের বিবরণ	১০০
টীকা	১০২

কাফেরদের' বিরুদ্ধে একটি অভিযানে নেতৃত্ব দেয়ার এবং গাজী^২ হবার ইচ্ছা আমার মনের মধ্যে জেগে উঠে। কারণ কাফেরদেরকে যিনি হত্যা করেন তাকে বলে 'গাজী' এবং হত্যা করতে (যুদ্ধে) গিয়ে কেউ যদি নিজে খুন হন তাহলে তাকে বলে 'শহীদ'— একথাটা আমার কানে এসেছিল।^{১০} এর ভিত্তিতে আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি। তবে আমি আমার এ অভিযান চীনের কাফেরদের বিরুদ্ধে, নাকি হিন্দুস্তানের কাফের ও বহু দেবতায় বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত করবো— সে ব্যাপারে মনকে স্থির করতে পারছিলাম না। আমি এব্যাপারে কোরআন থেকে কোন পূর্বাভাস পেতে চাইলাম এবং যে আয়াতটির^{১১} উপর আমার চোখ (চোখ বন্ধ করে কোরআনের পাতা উন্টিয়ে যেখানটায়) পড়লো সেটি হল, “হে নবী, কাফের ও অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন এবং তাদের সাথে কঠোর আচরণ করুন।”^{১২}

আমার বড় বড় কর্মকর্তারা আমাকে বলেছেন, হিন্দুস্তানের বাসিন্দারা কাফের এবং অবিশ্বাসী (ইসলামে ঈমান আনেনি)। আল্লাহর নির্দেশের প্রতি আনুগত্য সরূপ আমি তাদের বিরুদ্ধে একটি অভিযানে যাবার স্থিরসিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি এবং আমীর ও সেনাপতিদেরকে আমার সামনে হাজির হবার আদেশ জারি করি। তাঁরা যখন একত্রে এলেন, তখন আমি সেই সমাবেশকে প্রশ্ন করলাম, আমি কি হিন্দুস্তান আক্রমণ করবো, নাকি চীন? তাঁদেরকে বললাম, “আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সঃ)এর আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এইসব কাফের ও বহু দেবতায় বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আমার জন্য ফরজ (বাধ্যতামূলক)।”^{১৩} তাঁরা সবাই আনুগত্য সহকারে আমার জন্য সৌভাগ্য কামনা করলেন। আমি হিন্দুস্তান বা চীন কোন্ দেশের কাফেরদের বিরুদ্ধে আমার অভিযান পরিচালনা করবো তা আমার যোদ্ধা নেতা (সেনাপতি)দেরকে জিজ্ঞাসা করলাম। প্রথমে তারা বার বার নীতিকথা ও জ্ঞানের কথা শোনান এবং পরে বলেন, হিন্দুস্তান রাজ্যে চার ধাপের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে, কেউ যদি সেই বিস্তীর্ণ দেশে হামলা চালাতে চান তাহলে তাঁকে এই চার ধাপ বিশিষ্ট প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে দিতে হবে, তবেই তিনি হতে পারবেন হিন্দুস্তান বিজেতা।

প্রথম ধাপের প্রতিরক্ষায় রয়েছে পাঁচটি বড় নদী, যা কাশ্মীরের পর্বতগুলো থেকে প্রবাহিত এবং এই নদীগুলো তাদের গতিপথে একে অপরের সাথে মিলিত হয়েছে। নদীগুলো সিন্ধু রাজ্যের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হয়ে আরব সাগরে পতিত হয়েছে এবং নৌকা ও সেতু ছাড়া এইসব নদী পাড়ি দেয়া সম্ভব নয়। দ্বিতীয় প্রতিরক্ষায় রয়েছে বন, ঝোপ-জঙ্গল এবং গাছগাছালি, যার লতা-পাতা ও শাখা-প্রশাখা একটি অপরটির মধ্যে এমনভাবে ঢুকে আছে যার ফলে সেই দেশটিতে ঢোকা খুবই কঠিন। তৃতীয় প্রতিরক্ষায় রয়েছে দেশটির সৈন্যবাহিনী, জমিদার, রাজপুত্র (রাজপুরুষও বটে) ও রাজাগণ, যারা এইসব বন-জঙ্গলে শক্ত-পোক্তভাবে অবস্থান এবং বন্য জীব-জানোয়ারের মতই সেখানে বসবাস করতে পারে। চতুর্থ প্রতিরক্ষা গড়ে উঠেছে হাতির দ্বারা, যুদ্ধের দিন সেই রাজ্যের শাসকরা হাতিগুলোকে বর্ম হিসাবে ব্যবহার করে, তাদেরকে সৈন্যবাহিনীর সামনের দিকে রাখে এবং তাদের উপর ব্যাপকভাবে ভরসা করে। তারা হাতিগুলোকে এমনভাবে প্রশিক্ষণ দেয় যে, তারা তাদের গুণের দ্বারা একটি ঘোড়াকে তার সওয়ারীসহ তুলে নিয়ে শূন্য ঘুরিয়ে মাটিতে সজোরে ছুঁড়ে মারে।

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কেউ কেউ জবাবে বললেন, সুলতান মাহমুদ সবুজগিন ৩০ হাজার অশ্বরোহী নিয়ে হিন্দুস্তান জয় করেছিলেন এবং তাঁর নিজের কর্মচারীদেরকে সে অঞ্চলের শাসক হিসাবে বসিয়েছিলেন। তিনি কয়েক হাজার বোঝা স্বর্ণ, রৌপ্য ও অলংকার সেই দেশ থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন, একই সাথে দেশটিকে নিয়মিত রাজস্ব প্রদানের ব্যবস্থার আওতায় এনেছিলেন। আমাদের আমীর (তেমুর) কি সুলতান মাহমুদের চেয়ে কম যোগ্য? না, সর্বশক্তিমান আল্লাহর শোকর, আজ এক লাখ দুঃসাহসী তাতার অশ্বরোহী আমাদের আমীরের আদেশের অপেক্ষায় ঘোড়ার জিনে পা দিয়ে প্রস্তুত। যদি তিনি এই অভিযানের ব্যাপারে স্থিরসিদ্ধান্ত হন তাহলে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাঁকে বিজয় দান করবেন এবং তিনি আল্লাহর সামনে একজন গাজী ও মুজাহিদের মর্যাদা পাবেন এবং আমরাও এমন একজন আমীরের কর্মচারী হব, যিনি একজন গাজী। সৈন্যবাহিনীও পরিতৃপ্ত হবে, রাজকোষ সমৃদ্ধ ও ভালোভাবে পরিপূর্ণ হবে এবং হিন্দুস্তানের স্বর্ণভাণ্ডারের দ্বারা আমাদের আমীর হবেন বিশ্ব বিজেতা ও বিশ্বের সম্রাটদের মাঝে বিখ্যাত।

এই সময় রাজপুত্র শাহরুখ বলেন, “হিন্দুস্তান একটি বিস্তীর্ণ দেশ, সুলতান (মাহমুদ সবুজগিন) যা-ই জয় করেছিলেন তা বিশ্বের চারভাগের একভাগের উপর তাঁকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিল, যদি আমাদের আমীরের পরিচালনায় আমরা হিন্দুস্তান জয় করি, তাহলে আমরা সাতটি ভূখণ্ডের উপর শাসকে পরিণত হব।” এরপর

তিনি বলেন, “আমি পারস্যের ইতিহাসে দেখেছি যে, পারস্য সুলতানদের আমলে হিন্দুস্তানের রাজাকে সবধরনের সম্মান ও গৌরব সহকারে বলা হত ‘দারাই’। তাঁর মর্যাদা অনুসারে তিনি আর কোন নাম ধারণ করতেন না এবং রোমের সম্রাটকে ডাকা হত ‘সীজার’, পারস্যের সুলতানকে ডাকা হত ‘কিসরা’, তাতারদের সুলতানকে ‘খাকান’ এবং চীনের সম্রাটকে ‘ফাগফুর’ নামে, তবে ইরান ও তুরানের রাজা গ্রহণ করেন ‘শাহিনশাহ’ খেতাব এবং শাহিনশাহ’র আদেশ সবসময়ই হিন্দুস্তানের রাজপুত্র ও রাজাদের শিরোধার্য। সকল প্রশংসা আল্লাহর যে, আমরাই এখন ইরান ও তুরানের শাহিনশাহ এবং হিন্দুস্তান রাজ্যের উপর আমরা যদি ক্ষমতাবান না হই তাহলে তা হবে দুঃখজনক।” শাহজাদা শাহরুখের এইসব কথা শুনে আমি খুবই খুশী হয়েছি। এরপর শাহজাদা মোহাম্মদ সুলতান বললেন, “পুরো হিন্দুস্তান রাজ্য স্বর্ণ ও অলংকারে পরিপূর্ণ এবং এই দেশে স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরা, চুনি, পান্না, টিন, লৌহ, ইস্পাত, দস্তা ও পারদ ইত্যাদীর ১৭টি খনি রয়েছে। সেই দেশে যেসব গাছ-গাছালি জন্মায় সেসব পরিধানের পোশাক তৈরীর জন্য উপযুক্ত, সেখানে সুগন্ধি গাছ ও ইক্ষু জন্মায়। এটি এমন এক দেশ, যা সবসময় সবুজ ও তরতাজা এবং সবদিক থেকেই দেশটি সুখকর ও মনোরম। এখন যেহেতু এর বাসিন্দারা প্রধানতঃ বহু দেবতায় বিশ্বাসী, কাফের, মূর্তিপূজক ও সূর্য পূজারী, তাই আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশে তাদেরকে জয় করা আমাদের জন্য একটি সঠিক কাজ হবে।”

আমার উজির আমাকে খবর দিলেন যে, হিন্দুস্তানের সম্পূর্ণ রাজস্বের পরিমাণ হচ্ছে ৬ আর্ব, বর্তমানে এক আর্ব সমান ১০০ কোটি, এক কোটি সমান ১০০ লাখ এবং ১লাখ সমান ১লাখ মিসকাল রৌপ্য। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কেউ কেউ বললেন, “আল্লাহর রহমতে আমরা হিন্দুস্তান জয় করতে সক্ষম হব, কিন্তু আমরা যদি সেখানে নিজেদেরকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করি তাহলে আমাদের জাতি অধঃপতিত হবে এবং আমাদের সন্তানেরা ঐ অঞ্চলের স্থানীয় বাসিন্দাদের মতই হয়ে যাবে, এতে কয়েক পুরুষের মধ্যেই তাদের শক্তিমত্তা ও শৌর্য-বীর্য কমে যাবে।” সৈন্যবাহিনীর আমীররা এইসব কথায় বিব্রতবোধ করছিলেন, কিন্তু আমি তাদেরকে বললাম, “হিন্দুস্তানে আমার হামলা চালানোর উদ্দেশ্য হল কাফেরদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো, হযরত মোহাম্মদ (তাঁর ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক) এর আইন অনুযায়ী আমরা সেই দেশের লোকজনকে সত্যধর্মে দীক্ষিত করতে পারি এবং সেই ভূখণ্ডকে কুফরী ও বহু দেবতার আবর্জনা থেকে পবিত্র করতে পারি এবং তাদের মন্দির ও মূর্তিগুলো উচ্ছেদ করে আল্লাহর সামনে গাজী ও মুজাহিদ হিসাবে গণ্য হতে পারি।” তাঁরা

অনিচ্ছা সত্ত্বেও সম্মতি দেন, তবে আমি তাঁদের উপর কোন ভরসা রাখিনি। এই সময় ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানী (আলেম) লোকেরা আমার সামনে আসেন এবং কাফের ও বহু দেবতায় বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার যৌক্তিকতা নিয়ে আমাদের কথপোকথন শুরু হয়। তাঁরা মতামত দেন যে, “আব্রাহ ছাড়া ইবাদত পাবার যোগ্য আর কেউ নেই এবং হযরত মোহাম্মদ (সঃ) আব্রাহর রাসুল” – একথা যাঁরা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন ইসলামের সেই সুলতান ও সেইসব লোক তাদের ধর্মকে রক্ষা ও তার আইনকে শক্তিশালী করার স্বার্থে তাদের ধর্মের দুশমনদেরকে দমন করতে সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা খাটাবেন এটা তাদের কর্তব্য। প্রত্যেক মুসলমান ও সত্যিকার বিশ্বাসী (ঈমানদার)দের তাদের শাসকের প্রতি অনুগত থাকার সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা থাকা কর্তব্য। যখন এই জ্ঞানী ব্যক্তিদের উপদেশমূলক কথাগুলো বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কানে পৌঁছলো তখন তাঁরা অন্তর দিয়ে হিন্দুস্তানের পবিত্র যুদ্ধে (জেহাদ) মনোনিবেশ করলেন এবং সর্বাঙ্গিক আনুগত্য সহকারে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিজয়ের অধ্যায় আরেকবার রচনা করলেন।

অভিযানের জন্য আমি যখন কোমর বেঁধে নামলাম, আমি হযরত শেখ জইনুদ্দিনকে লিখে জানালাম যে, আমি হিন্দুস্তানে একটি ধর্মীয় অভিযানে যাবার স্থিরসিদ্ধান্ত নিয়েছি। তিনি আমার পত্রের কিনারে লিখলেন, “আবুল গাজী তৈমুর (আব্রাহ তাঁকে সহায়তা করুন) এটা জেনে রাখুন যে, এই উদ্যোগের ফলে আপনি ইহকালে এবং পরকালে বিরাট সৌভাগ্য (বা উন্নতি) লাভ করবেন। আপনি যান এবং নিরাপদে ফিরে আসুন।” তিনি আমার জন্য একটি তরবারীও পাঠান, যা আমি আমার রাজদণ্ড করে রেখেছি।

ইতিমধ্যে কাবুলিস্তানের সীমান্ত থেকে শাহজাদা পীর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীরের একটি আবেদনপত্র আসে। কুন্দুজ ও বাকালান, কাবুল ও গজনী এবং কান্দাহার নিয়ে এই দেশটির সরকার তাঁর হাতে অর্পণ করা ছিল। চিঠিটিতে দৃষ্টিপাত করে আমি দেখলাম তাতে লিখা রয়েছে, “আপনার আদেশে আমি এই দেশে আসার পর থেকে মহান সম্রাটের প্রশংসনীয় আদেশ ও বিচক্ষণতা-বুদ্ধিকারী উপদেশ অনুসারে সমস্ত জনগণের সাথে আচার-ব্যবহার করেছি। এই রাজ্য জয় ও এখানে অবস্থানের দ্বারা আমি আমার মনকে সন্তুষ্ট করার পর হিন্দুস্তানের কিছু প্রদেশ অর্জন করার দিকে আমি মনোনিবেশ করেছি। আমি দেশটির অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়েছি এবং নিলিখিত বিবরণ পেয়েছি যে : সার্বভৌম হিন্দুস্তানের রাজধানী হচ্ছে দিল্লী। সুলতান ফিরোজ শাহ’র মৃত্যুর পর তাঁর অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যকার দুইভাই – একজনের নাম মাল্লু এবং আরেকজন সারাগ – খুবই শক্তিশালী হয়ে ওঠেন, তাঁদের স্বাধীনতা (ক্ষমতা) প্রতিষ্ঠিত করেন, তাঁরা

সুলতান ফিরোজ শাহ'র পুত্রদের মধ্য থেকে সুলতান মাহমুদ নামের একজনকে নামমাত্র ক্ষমতায় বসালেও প্রকৃত ক্ষমতা তাঁরা তাঁদের হাতে রেখে দেন এবং প্রকৃত অর্থে তাঁরাই রাজ্য শাসন করতে থাকেন। মাল্লু দিল্লীতে সুলতান মাহমুদের কাছাকাছি থাকছেন এবং সারাজ মুলতানে সেই রাজ্যটিকে সুরক্ষা দেবার জন্য সেখানেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। আমি এইসব বিষয় অবগত হবার পর মহান সম্রাটের রীতি অনুসরণ করে একটি পত্র লিখে একজন দূতের মাধ্যমে তাঁর (সারাজ) কাছে পাঠাই, তাঁকে বুঝানোর চেষ্টা করি যে, মহান সম্রাটের বিজয় অভিযান ও বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের কথা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে বিধায় এটা নিশ্চিত যে, এই খবর তাঁর (সারাজ) কাছেও পৌঁছেছে। হিন্দুস্তানের সীমান্তের কাছাকাছি যেসব প্রদেশ রয়েছে মহান সম্রাট আমাকে সেসবের সরকারে নিযুক্ত করেছেন এবং আদেশ দিয়েছেন যে, যদি হিন্দুস্তানের শাসকরা রাজস্ব সহকারে আমার সামনে আসেন তাহলে আমি যেন তাঁদের প্রাণ, সম্পত্তি বা সাম্রাজ্যে হস্তক্ষেপ না করি, কিন্তু যদি তাঁরা আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের ব্যাপারে অবহেলা করেন তাহলে হিন্দুস্তান সাম্রাজ্য জয় করার জন্য আমি আমার শক্তি-মত্তা তাদের সামনে তুলে ধরবো। সর্বপ্রকারে তাঁরা যদি তাঁদের প্রাণ, সম্পত্তি ও ইজ্জত-সম্মানকে কোন রকম দাম দিয়ে থাকেন তাহলে তাঁরা আমাকে বাৎসরিক রাজস্ব প্রদান করবেন এবং যদি তা না হয়, তাহলে তাঁরা শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী নিয়ে আমার আগমনের সংবাদ শুনতে পাবেন। বিদায়।” দূত মুলতানে সারাজের কাছে পৌঁছলে তিনি তাঁকে ব্যাপক সম্মান ও গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেন, তবে পত্রের জবাবে (দূতকে) সারাজ বলেন, ‘যাতনা ও প্রতিবন্ধকতা এবং তরবারীর সাথে সংঘর্ষ বিনা একটি সাম্রাজ্যকে বধূর মত আপনার বুকে টেনে নেয়া অত সহজ নয়। আপনার শাহজাদার ইচ্ছা জেগেছে এই রাজ্যকে তার সমৃদ্ধ রাজস্ব সহকারে নিয়ে নেবার। ঠিক আছে, তাঁকে বলুন তিনি যদি পারেন তাহলে এই রাজ্য বাহুবলে তিনি আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিন। আমার প্রচুর সৈন্য ও ভয়ংকর হাতি রয়েছে এবং আমি যুদ্ধের জন্য ভালোভাবেই প্রস্তুত রয়েছি।’ এই কথা বলে তিনি দূতকে বিদায় করেন। কিন্তু এই অসন্তোষজনক জবাব যখন আমার কাছে আনা হল, তখন আমি আমীর সাইকাল কান্দাহারী ও এ ধরনের অন্যান্য আমীরের মত যত বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং সৈন্য আমার প্রদেশে রয়েছে তাঁদেরকে সহ সব ধরনের সৈন্যবাহিনীকে তৈরী হবার জন্য তাৎক্ষণিক নির্দেশ জারি করি। হিন্দুস্তানে হামলা চালানোর জন্য আমি তৈরী হই। সুলায়মান পার্বত্যাঞ্চলে বসবাসরত আফগানীদের দেশ আমি লুণ্ঠন করে আবর্জনা পরিণত করেছি এবং দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে সিন্ধু নদী পাড়ি দিয়ে উচ নগরীতে হামলা চালিয়েছি এবং মহান সম্রাটের

সৌভাগ্যের জোরে এই নগরী আমি দখল করেছি। সেখানে একটি সৈন্যশিবির হিসাবে একদল লোক মোতায়েন রেখে আমি মুলতানের দিকে এগিয়ে যাই, সেটি অবরোধ করি, তবে সারাজ দুর্গটিকে যত্নের সাথে সুরক্ষিত ও শক্তিশালী করে তুলেছিলেন, তাই অবরোধ কিছুদিন বিলম্বিত হয় এবং প্রকৃতপক্ষে আমি এই মুহূর্তে অবরোধ করেই বসে আছি, প্রতিদিন দুইবার করে হামলা চালাচ্ছি। প্রত্যেক বিশিষ্ট ব্যক্তিই (আমীর)– আরো বিশেষভাবে আমীর আকুঘার পুত্র তৈমুর খাজা– বিপুল বিক্রম ও সাহস প্রদর্শন করেছেন, এবং এখন আমি আর কোন নির্দেশনার জন্য অপেক্ষা করছি।” এই চিঠি পড়ার পর আমার ইতিপূর্বকার সিদ্ধান্তই নিশ্চিত ও শক্তিশালী হয়।

হিন্দুস্তানের কাফেরদের বিরুদ্ধে পবিত্র যুদ্ধ (জেহাদ)

আমি এমনভাবে আয়োজন করলাম যে, ঐ বছরের বসন্তকালের মধ্যেই আমার শাসনাধীন সারা দেশের সমস্ত অংশ থেকে সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ করে ফেলি এবং আবজাদের শাসন অনুসারে ‘কারিব ফত্হ’ কথাটির দ্বারা যা ব্যক্ত করা যায়— সেই মঙ্গলজনক মাস রজব, ৮০০ হিজরী (মার্চ ১৪০৮) শাহজাদা মীর্জা শাহের পুত্র শাহজাদা ওমরকে সমরখন্দে আমার রাজপ্রতিনিধি হিসাবে নিযুক্ত করে, তাঁর হাতে কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সৈন্য ছেড়ে দিয়ে আমি এক শুভ মুহূর্তে ঘোড়ার জিনের রেকাবে পা রাখি এবং আমার রাজধানী সমরখন্দ ত্যাগ করে হিন্দুস্তানের দিকে পথ ধরি। চলার পথে আমি শিকারেও যাই। আমি তুরমুজে পৌঁছে জিহ্নন নদীর উপরে নৌকার দ্বারা সেতু তৈরী করতে নির্দেশ দেই, আমি আমার পুরো সৈন্যবাহিনী নিয়ে নদী অতিক্রম করে খুলমের একটি গ্রামে শিবির স্থাপন করি। স্থান ত্যাগ করার ঢাক বাজিয়ে সেই স্থান থেকে পথ চলতে চলতে ঘাজতিক ও সামানকান অতিক্রম করে ইন্দ্রাবে পৌঁছি। সেই স্থানের বিশিষ্ট ব্যক্তি ও উচ্চ-নিচ সব ধরনের জনগণ দলে দলে আমার সাথে দেখা করার জন্য আসতে থাকে। এক পর্যায়ে সবাই কান্নাকাটি ও আর্তনাদ করে আমার কাছে ন্যায়বিচার চায়। আমি তাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রধানকে ডেকে তাঁদের দ্বারা একটি তদন্তদল গঠন করে দেই যাতে তারা ব্যাপারটা সম্পর্কে খোঁজ খবর নেয়।

আনুগত্য সহকারে তারা তাদের পরিস্থিতি তুলে ধরে কাফের কাটোর ও সিয়াহ-পোশদের হাত থেকে তাদেরকে রক্ষার দাবী জানায়। তারা বলে, এইসব নির্যাতনকারী কাফেরদের বিরুদ্ধে আমরা ইসলামের সম্রাটের সামনে আমাদের আর্জি পেশ করছি। এই কাফের কাটোর ও সিয়াহ-পোশরা আমরা যারা সত্যিকার ঈমানদার (ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী) তাদের উপর প্রতিবছর করারোপ করে এবং ভয় দেখিয়ে তা আদায় করে। আমাদের উপর ধার্যকৃত রাজস্ব আদায়ে আমরা যদি সামান্যতমও ব্যর্থ হই তাহলে তারা আমাদের পুরুষদেরকে হত্যা করে এবং নারী ও শিশুদেরকে নিয়ে গিয়ে দাস বানিয়ে ফেলে। তাই আমরা অসহায় মুসলমানরা মহান সম্রাটের সামনে সুরক্ষা পাবার জন্য উপস্থিত হয়েছি, যাতে আমরা যারা

উৎপীড়নের শিকার, এইসব কাফেরদের ব্যাপারে আমাদের আকুল মনোবাহুঁতা তিনি মঞ্জুর করেন। এইসব কথা শুনে ইসলামের প্রতি আমার ব্যাপক আশ্রহ ও ধর্মের প্রতি আমার ভালোবাসা জ্বলে উঠলো এবং আমি ঐসব মুসলমানের উদ্দেশে নিলিখিত সান্ত্বনামূলক বক্তব্য রাখি:- সর্বশক্তিমান আল্লাহর সাহায্য ও সহযোগিতায় এইসব উৎপীড়ক কাফের কাটোর ও সিয়াহ-পোশদের বিরুদ্ধে আপনাদের অন্তরের একান্ত চাওয়া আমি মঞ্জুর করবো এবং আপনারা যারা মুসলমান তাদেরকে আমি এই বিধর্মীদের স্বেচ্ছাচারী শাসন থেকে মুক্তি দেব। তারা আল্লাহর কাছে তাদের হাত তুলে আমার জন্য রহমত কামনা করে।

কাফের কাটোর ও সিয়াহ-পোশদের বিরুদ্ধে পবিত্র যুদ্ধের বর্ণনা

আমি তৎক্ষণাৎ আমার সৈন্যবাহিনী থেকে ১০টি দলকে বেছে নিলাম এবং বাকী সৈন্যবাহিনী ও মালপত্রের দায়িত্বের নেতৃত্ব শাহজাদা শাহরুখের উপর দিয়ে তাঁকে তিলক ঘুনান ও দিকতুরে রেখে আমি নিজে কাফের কাটোরদেরকে কঠোর শাস্তি দেবার জন্য ষোড়ার জিনের রেকাবে পা রাখি। পায়ে অশ্ব তাড়ানো কাঁটা লাগিয়ে আমি খুবই দ্রুত সামনের দিকে অগ্রসর হই, দুইদিনের পথ আমি ২৪ ঘণ্টায় অতিক্রম করি। পারিয়ান নামক স্থানে পৌঁছে আমি শাহজাদা রুমতম ও বুরহান আঘলান জুজিতারকে আলাদা করে দেই, তাঁরা সিয়াহ-পোশদের দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমার প্রধান প্রধান আমীরদের মধ্যে গণ্য হতেন। সিয়াহ-পোশদের দেশটি ছিল আমাদের বাম দিকে। তাঁদের সাথে আমি কিছু আমীর এবং ১০হাজার অশ্বারোহীর একটি দল পাঠিয়ে দিই, এই সময় আমি নিজে কাটোরদের পার্বত্যঞ্চলের দিকে আমার যাত্রা অব্যাহত রাখি। ইন্দ্রাবের প্রধান ব্যক্তি মুজিদের কাছে যখন আমি সেই রাজ্যের পরিধি ও হাল অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাই, তখন তিনি আমাকে জানান যে, কাটোরদের রাজ্যের পরিধি কাশ্মীর সীমান্ত থেকে কাবুলের পার্বত্যঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এই দেশে বহু শহর ও গ্রাম রয়েছে। বড় নগরীগুলোর একটির নাম শোকাল ও আরেকটির নাম যোরকাল, এই নগরীতেই শাসক বাস করেন। দেশটিতে প্রচুর ফল উৎপাদিত হয়, যেমন আঙ্গুর, আপেল, খোবানি (কুল জাতীয় ফল) এবং আরো নানান রকম। চাল এবং অন্যান্য শস্যও চাষ করা হয়। প্রচুর মদ তৈরী হয় এবং বড়-ছোট সব ধরনের লোক তা পান করে। লোকেরা শূকরের মাংস খায়। দেশটির সর্বত্র গৃহপালিত গবাদি পশু ও ভেড়া রয়েছে। দেশটির বেশীরভাগ বাসিন্দাই মূর্তিপূজক। পুরুষদের দৈহিক গঠন শক্ত-পোক্ত এবং গায়ের রং সুন্দর। তাদের ভাষা তুর্কী, পারস্য- হিন্দি ও কাশ্মীরী থেকে আলাদা। তাদের অস্ত্র হচ্ছে তীর, তরবারী ও প্রস্তর নিক্ষেপকারী যন্ত্র। তাদের শাসককে ডাকা হয় 'আদালত'^৭। আমি খাওয়াকে পৌঁছার পর একটি ভগ্নপ্রায় দুর্গ দেখতে পেয়ে সেটিকে মেরামত করার প্রয়োজন অনুভব করি।

তাই আমি তৎক্ষণাৎ সৈন্যদেরকে সমেতে নির্দেশ দেই এবং তা দ্রুত কার্যকর হয়। যেহেতু পথের বেশীরভাগ অংশই ছিল পাথুরে ও খুব খাড়া, তাই আমি বেশীরভাগ আমীর ও সমস্ত সৈন্যদেরকে অশ্ব, উট ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত মালপত্র দুর্গে ত্যাগ করে যাবার জন্য নির্দেশ দেই। এই আদেশের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে বেশীরভাগ আমীর ও সমস্ত সৈন্য আমার সাথে পায়দলে চলতে থাকে, সে সময় আমি আল্লাহর সহায়তার উপর ভরসা করে কাটোর জয়ে দ্রুত সামনের দিকে ধাবিত হতে থাকি এবং পাহাড়ের উপর উঠতে শুরু করি। বাতাসে তাপ সত্ত্বেও পাহাড়ের উপর এতবেশী বরফ ছিল যে, লোকদের এবং গবাদি পশুগুলোর পা অসহায়ভাবে তাতে ডুবে যাচ্ছিল। তাই আমি দিনের বেলায় খামতে বাধ্য হই, কিন্তু রাতের বেলা বরফ যখন জমাটবদ্ধ হয়ে যায় তখন আমি সেই হিমায়িত ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছা পর্যন্ত পথ চলতে থাকি। ভোরের দিকে বরফ গলে যেতে থাকলে এর উপর গালিচা ও অশ্বের চামড়া বিছিয়ে দিয়ে অশ্বগুলোকে এর উপর দাঁড় করিয়ে রাখি। রাত নামার সাথে সাথে আমরা আবার আগের মত চলতে শুরু করি এবং এভাবে আমি অনেকগুলো উচ্চ পর্বত অতিক্রম করি, তবে আমীররা তাঁদের সাথে যে অশ্বগুলো এনেছিলেন তার অনেকগুলোকে দুর্গে ফেরত পাঠাতে বাধ্য হন। আমি যখন একটি উচ্চ পর্বতের শীর্ষে পৌঁছি, এত উচ্চ পর্বত সেখানে আর একটিও ছিল না— আমি দেখলাম এইসব দুষ্ট কাফেররা পাহাড়ের অন্ধকার গুহাগুলোর ভিতরে তাদের অবস্থান গ্রহণ করেছে, গুহাগুলোর প্রবেশপথ বরফ দ্বারা প্রতিবন্ধক আরোপ করা, আর এর ফলে গুহাগুলো দুষ্প্রবেশ্য হয়ে উঠে, শুধু তাই নয়, আমার সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পাহাড় থেকে নামার একটি পথ আমি পাচ্ছিলাম না। আমার সৈন্যদেরকে যত উত্তমভাবে সম্ভব পাহাড় থেকে নিচে নামার জন্য নির্দেশ দিতে আমি বাধ্য হই। আমীর এবং সৈন্যরা নিচে নামতে শুরু করে। কেউ কেউ নিচের দিক বরাবর হয়ে বরফের উপর শুয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে নামতে থাকে। অন্যরা তাদের কোমরে সাধারণ দড়ি এবং তাঁবুর লম্বা দড়ি শক্ত করে পেঁচিয়ে, দড়ির অপরপ্রান্ত পাহাড়ের উপরের গাছ বা পাথরে বেঁধে আস্তে-ধীরে নামতে থাকে। আমার ব্যাপারে আমি তাদেরকে তক্তা ও কঞ্চির দ্বারা একটি ঝুড়ি বানানোর জন্য বললাম। তারা ঝুড়িটি তৈরী করার পর এর চার কোনায় তারা লম্বায় দেড়শত গজ বিশিষ্ট দড়ি লাগায়। কাফেরদের বিরুদ্ধে এই অভিযানের পরিকল্পনা গ্রহণের সময়ই সব ধরনের অসুবিধা ও হয়রানির ব্যাপারে আমি আমার মনকে তৈরী করে নিয়েছিলাম, তাই সেই ঝুড়িতে আমি বসি, এরপর একদল লোক (পাহাড়ের উপর থেকে) দড়ির প্রান্ত ধরে এই দড়িগুলোকে আস্তে-ধীরে ঝুড়িটিসহ নিচের দিকে ছাড়তে থাকে, এভাবে পুরো দড়ি (দেড়শত গজ) ছাড়ার পর (ঝুড়িটি একস্থানে স্থির হবার পর)

কিছুলোক আমার ঝড়ির সামনে হামাগুড়ি দিয়ে কোদাল ও কুড়াল দ্বারা তুষার ও বরফ সরিয়ে আমার দাঁড়ানোর একটি স্থান করে নেয়। যারা উপর থেকে দড়ি ছাড়ছিল তারা এবার সেখানে নেমে আসে এবং আগের মত করে আস্তে-ধীরে দড়ি শেষ হওয়া পর্যন্ত (দেড়শত গজ) নামায়। এভাবে পাঁচবার করার পর আমি পাহাড়ের নিচে এসে পৌছি। এভাবেই সব আমীর ও সৈন্যরা নেমে আসে, কিছু অশ্ব- যেগুলো ছিল আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি, আমার সাথে সেগুলোকে আনা হয়েছিল- সেগুলোকেও একইভাবে অর্থাৎ সেগুলোর পা ও কাঁধে দড়ি বেঁধে নামিয়ে আনা হয়, তবে সমস্ত অশ্বের মধ্যে কেবলমাত্র দু'টিই নিরাপদে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়, বাকী গুলো পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লেগে লেগে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। যখন আমার আর কোন লোক উপরে অবশিষ্ট রইল না, তখন যেহেতু আমার উদ্দেশ্য ছিল কাফেরদেরকে সমূলে খতম করে দেয়া, তাই আমি আমার রাজকীয় তরবারী হাতের মুঠোয় আঁকড়ে ধরে আমার আমীর ও সৈন্যদেরকে সাথে নিয়ে সেই পাথুরে দেশটির মধ্যে পায়ে হেঁটে এক পারাসাং পর্যন্ত সামনে এগিয়ে যাই। আমার আমীরদের একান্ত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আমি আবারো অশ্বের পিঠে চড়ি, কিন্তু সমস্ত প্রধান প্রধান ব্যক্তি তাঁদের সৈন্যদের সাথে নিয়ে দ্রুতগতিতে পায়ে হেঁটে পথ চলতে থাকেন। কাটোরের শাসকের একটি দুর্গ ছিল, যার একদিকে ছিল একটি নদী এবং নদীর একটু দূরে একটি উচ্চ পর্বত, যা নিচে নেমে এসে পানি ছুঁয়েছে। আমি এসে পৌছানোর একদিন আগেই কাফেররা আমার এগিয়ে আসার খবর পেয়ে যাওয়ায় তারা আতঙ্কিত হয়ে দুর্গ থেকে তাদের সমস্ত ধন-সম্পদ সরিয়ে নিয়ে নদী পাড়ি দিয়ে পর্বতের মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নেয়- যেগুলো ছিল উচ্চ। গুহার মধ্যে গিয়ে তারা বিপুল সংখ্যায় প্রবেশ করে, গুহাগুলো ছিল দুঃপ্রবেশ্য। এ অবস্থায় আমার কাছে ভুলে ধরা হয় যে, এসব এলাকায় কাটোরের শাসকদের সবচেয়ে শক্তিশালী দুর্গ ছিল এটি। একথা শুনে আমি দুর্গটি দখল করে নেবার সিদ্ধান্ত নিই। আমি যখন দুর্গটির পাশের এলাকার মধ্যদিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম তখন সেখানে কাফেরদের চিহ্নমাত্রও দেখতে পেলাম না এবং এলাকাগুলোতে গিয়ে আমি দেখতে পাই যে, তারা এসব ত্যাগ করে পালিয়ে গেছে। আমি এখানে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসাবে প্রচুর ভেড়া ও অন্যান্য জিনিস পাই এবং যে নগরীটির মাঝখানে দুর্গটি নির্মাণ করা হয়েছিল সেই নগরীটির বাড়ী-ঘর ও দালানগুলোতে আশ্রয় লাগিয়ে দেবার এবং মাটির সাথে মিশিয়ে দেবার আদেশ দেই। এরপর আমি দ্রুত নদী পাড়ি দিয়ে শত্রুদের চলাচলের ফলে সৃষ্ট পথচিহ্ন ধরে চলতে থাকি। আমি সেই পর্বতের প্রান্তে পৌছি, যেখানে কাফেররা সংকীর্ণ গিরি-সংকটে ও অন্যান্য শক্তিশালী স্থানে অবস্থান নিয়েছিল। আমি তৎক্ষণাৎ আমার সাহসী ও অভিজ্ঞ সৈন্যদেরকে পর্বতে উঠার

নির্দেশ দেই। রণধ্বনি করতে করতে এবং উচ্চৈশ্বরে তাকবীর^৮ বলতে বলতে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে। অন্য সবার আগে শেখ আরসালান আজতুমান কাবাক খান-যিনি ছিলেন যুদ্ধের দিনের সিংহ- বাম পার্শ্ব দিয়ে পর্বতে উঠে পড়েন এবং যুদ্ধ শুরু করেন। তাঁর লোকজন নিয়ে কাফেরদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তিনি তাদেরকে পলায়নপর করে ছাড়েন। তিনি তাদের পিছু ধাওয়া করে পাথুরে পর্বতের মধ্যকার সেই দুর্গ (প্রাকৃতিক) গুলোর মধ্যে ঢুকে পড়েন এবং বহুসংখ্যক পাপীষ্ঠ বিধর্মীকে জাহান্নামে প্রেরণ করেন। তাঁর পাশে অবস্থান নিয়ে তাওয়াছি আলী সুলতানও শত্রুর উপর দুঃসাহসী আক্রমণ চালান এবং তাঁর নিজের সৈন্যদল দ্বারা হামলা চালিয়ে কাফের শত্রুদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে তাদের অনেককে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেন। তাঁর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আমীর শাহ মালিকও বিরাট বিক্রম প্রদর্শন করেন, বিপুল সংখ্যক কাফেরকে তিনি হত্যা করেন এবং তাদেরকে সেই পর্বত এলাকা থেকে পুরোপুরি বের করে দেন। মুবাশশির বাহাদুর, মানকালি খাজা, সুনযাক বাহাদুর, শেখ আলী সালার, মুসা জাকমাল, হোসেন মালিক কাচিন, মীর হোসেন কার এবং অন্যান্য আমীররা বিরাট বীরত্ব প্রদর্শন এবং তাঁদের তরবারীকে ভালোভাবেই ব্যবহার করেন। বিধর্মী শত্রুদের বিরুদ্ধে ইসলামের প্রতি তাঁরা তাঁদের মহাবীরত্বের প্রমাণ দেন ও কাফেরদেরকে পরাভূত করে তাদের অনেককে হত্যা করেন এবং তাদের পার্বত্য (প্রাকৃতিক) দুর্গগুলোর দখল নেন। সামান্য কিছু সংখ্যক শত্রুই কেবল আহত ও ক্লান্ত-অবসন্ন হয়ে অক্ষম অবস্থায় গুহাগুলোতে আশ্রয় নিতে সক্ষম হয়েছিল। আমার সৈন্যদের মধ্যে মাত্র চৌদ্দজন প্রাণ হারায় এবং এই ঘটনা ঘটেছিল পর্বতের মধ্য দিয়ে পথ করে নেবার সময়। কিছু সংখ্যক কাফের সংকীর্ণ গিরি-সংকটগুলোতে তিন দিন তিন রাত্রি অবস্থান করে, তবে আমি আমার সাহসী সৈন্যদেরকে তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করে এমন চাপ সৃষ্টি করি যে, তারা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় এবং আশ্রয় প্রার্থনা করে। আমি আ'ক সুলতানকে তাদের কাছে এই বার্তা নিয়ে প্রেরণ করি যে, যদি তারা বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ, ইসলাম গ্রহণ ও কালেমা পাঠ করতে রাজি হয় তাহলে আমি তাদেরকে আশ্রয় দেব, কিন্তু তা না হলে আমি তাদেরকে খতম করে দেব। আ'ক সুলতান কাফেরদের কাছে এই বার্তা নিয়ে গিয়ে একজন দোভাষীর মাধ্যমে একইসাথে তাদের ভাষায় ও তুর্কী ভাষায় তাদেরকে বুঝিয়ে বললে তারা স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার মধ্যদিয়ে মুসলমানদের ধর্ম গ্রহণ করতে রাজি হয়। তাদের এই বাহ্যিক প্রকাশ্য ঘোষণার ভিত্তিতে আমি তাদের জান ও মালকে রেহাই দেই এবং কেউ যাতে তাদের জান, মাল বা দেশে হস্তক্ষেপ না করে তার নির্দেশ প্রদান করি। এরপর তাদের কিছু সংখ্যককে আমি সম্মানমূলক পোশাক প্রদান করে বিদায় দেই। আমি আমার সৈন্যবাহিনী নিয়ে সেই রাতটি সেখানে

অবস্থান করি। এইসব অন্ধকার-মনের কাফেররা রাতের বেলা আমীর শাহ মালিকের সৈন্যবাহিনীর উপর হামলা চালায়, তবে এই নেতা সতর্ক ছিলেন বিধায় শত্রুরা তাদের অসদুদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়। তাদের অনেককে হত্যা করা হয় এবং দেড়শত জন আমাদের হাতে জীবিত ধরা পড়ে, পরে আমার তুচ্ছ সৈন্যরা তাদেরকে মেরে ফেলে। দিনের শুরু হবার সাথে সাথে আমি আমার সৈন্যদেরকে একইসাথে চারদিক থেকে হামলা চালাতে এবং সংকীর্ণ গিরি-সংকটগুলোর মধ্যদিয়ে সবেগে ঢুকে পড়ে তাদের পুরুষদেরকে হত্যা, নারী ও শিশুদেরকে বন্দী এবং তাদের সম্পদ ধ্বংস ও আবর্জনায় পরিণত করে দিতে নির্দেশ দেই। আমার নির্দেশের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে আমীর ও সৈন্যরা সবদিক থেকে একসাথে দুঃসাহসী হামলা চালিয়ে কাফেরদের সেই অবশিষ্টাংশকে তরবারীর খোরাতে পরিণত করে এবং পরপারে শান্তির ঘরে পাঠিয়ে দেয়। তাদের নারী ও শিশুদেরকে তারা (সৈন্যরা) বন্দী এবং প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হস্তগত করে। সেইসব জেদী বিধর্মীর মাথার খুলি দিয়ে পর্বতের উপর একটি মিনার তৈরী করতে আমি নির্দেশ দেই এবং আমার শিবিরে থাকা একজন পাথর খোদাইকারীকে আমি আদেশ দেই, সে যেন ঐসব সংকীর্ণ গিরি-সংকটের কোন একখানে এই মর্মে খোদাই করে লিখে দেয় যে, আমি ৮০০ হিজরীর (১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দ) রমজান মাসে এইভাবে এবং এই ধরনের সব পথ পাড়ি দিয়ে এই দেশে পৌঁছেছিলাম। এটা এই জন্য যে, যদি সুযোগ কাউকে কখনো এইস্থানে নিয়ে আসে তাহলে আমি কিভাবে এখানে এসে পৌঁছে ছিলাম সেটা সে জানতে পারবে।

এই সময় আমি শাহজাদা রুমতম ও বুরহান আঘলানের কোন খবর পাচ্ছিলাম না— এই দুইজনকে সৈন্যসহ আমি সিয়াহ-পোশদের দেশের বিরুদ্ধে প্রেরণ করে ছেড়ে এসেছিলাম। এর আগে আরেক ঘটনা উপলক্ষে আমি এই বুরহান আঘলানকে একটি লুঠনধর্মী আক্রমণে নেতা বানিয়ে প্রেরণ করেছিলাম, তখন তিনি সাংঘাতিক রকম আলস্য ও সামরিক অযোগ্যতা প্রদর্শন করেছিলেন (সেই অযোগ্যতা কাটিয়ে উঠে যোগ্যতা প্রদর্শনের জন্য আমি তাঁকে বর্তমান ঘটনা উপলক্ষে নেতৃত্ব তুলে দিয়েছি)। তিনি কি করছেন তা নিয়ে আমার মনের মধ্যে একটা সন্দেহ সৃষ্টি হয়। এক রাতে আমি স্বপ্নেও দেখলাম যে, আমার তরবারী বাঁকা হয়ে গেছে। এর ব্যাখ্যা আমি এভাবে দাঁড় করালাম যে, বুরহান আঘলান পরাজিত হয়েছেন। আমি যাদেরকে লালন-পালনের মাধ্যমে বড় করে তুলেছিলাম তাদের অন্যতম মোহাম্মদ আজাদকে সেখানে গিয়ে আঘলানের খবর নেবার জন্য আমি তাৎক্ষণিকভাবে নিয়োগ করলাম। আমি তাঁর নেতৃত্বের অধীনে দৌলত শাহ, আইরাকুলি আদিঘুরের পুত্র শেখ আলী, শেখ মোহাম্মদ ও আলী বাহাদুরকেসহ চারশত লোক দিলাম— যাদের মধ্যে তাতার ছিল একশত জন এবং অন্য তিনশত

জন ছিল তাজিক-এবং তাদেরকে পথ দেখানোর জন্য একজন স্থানীয় কাটোরকে দিলাম। মোহাম্মদ আজাদ তাঁর বীর দলটিকে নিয়ে তৎক্ষণাৎ যাত্রা শুরু করেন এবং তুষার ও বরফ আচ্ছাদিত উচ্চ পর্বতগুলো পাড়ি দিয়ে, সংকীর্ণ গিরি-সংকটের মধ্যদিয়ে, বহু ছোট খাড়া পাহাড় ও বরফাচ্ছাদিত ভূখণ্ড পেরিয়ে অবশেষে পার্বত্যাঞ্চল থেকে বের হয়ে সমতল ভূমিতে পৌঁছেন। মোহাম্মদ আজাদ পার্বত্যাঞ্চল থেকে বেরিয়ে এসে সিয়াহ-পোশদের দুর্গের কাছে পৌঁছেন এবং সেটিকে খালি দেখতে পান। শত্রুরা ইসলামের বাহিনীর ভয়ে সেটি ছেড়ে চলে গেছে এবং পার্বত্য গিরি-সংকটগুলোতে আশ্রয় নিয়েছে। এখন বুরহান আঘলানের দুঃসাহসিক অভিযানের বিবরণ নিরূপ : যখন তিনি এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন আমীরগণ, যেমন ইসমাইল, আব্রাহাদ ও সুবক তৈমুর প্রমুখ এবং সৈন্যরা দুর্গে পৌঁছে দেখতে পান, সেটি খালি, তখন তারা অসাবধানতার সাথে শত্রুদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে সংকীর্ণ গিরি-সংকটে চলে আসেন। তাঁরা অল্প কিছু সংখ্যক অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যকে পাহারা দেবার জন্য পর্বতের নিচে রেখে যান। কাফেররা তাদের গুপ্তস্থান থেকে বেরিয়ে এসে সত্যিকার ঈমানদারদের উপর প্রচণ্ডবেগে হামলা চালায়। বুরহান আঘলানের কাপুরুষতা ও সামরিক অযোগ্যতা এমনই ছিল যে, তিনি অস্ত্র ছুঁড়ে ফেলে একটিও পাল্টা আঘাত না করে পলায়ন করেন। সৈন্যরা যখন তাদের নেতার পলায়ন দেখলো তখন তারা হতাশ হয়ে পড়ে এবং পরাজিত হয়। কাফেররা তাদেরকে খুব কাছ থেকে অনুসরণ করে অনেক সত্যিকার ঈমানদারকে শহীদ করে দেয়। সৈন্যবাহিনীর আমীরদের মধ্যে দৌলত শাহ, শেখ হোসেন সুচি ও আদিনা বাহাদুর ব্যাপক সাহস প্রদর্শন করেন, তবে বহু কাফেরকে হত্যার পর শেষপর্যন্ত তাঁরা শহীদী শরবত পান করেন। বুরহান আঘলান বহু অশ্ব ও যুদ্ধসজ্জার বাস্ত্র-প্যাঁটরা কাফেরদের শিকারে পরিণত করে পালিয়ে যান।

মোহাম্মদ আজাদ তাঁর চারশত লোক সাথে নিয়ে পরিত্যক্ত সিয়াহ-পোশ দুর্গে পৌঁছে শত্রুদের গতিপথ অনুসরণ করে পর্বতের দিকে চলে যান। বুরহান আঘলানের পরাজয় ও পলায়নের স্থানে পৌঁছলে বুরহান আঘলানকে যারা পরাজিত করেছিল তিনি সেইসব কাফেরদের দ্বারা আক্রান্ত হন। তবে তিনি সাহসিকতার সাথে লড়ে তাদেরকে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞের মাধ্যমে ছত্রভঙ্গ করে দেন এবং এইসব পাপীষ্ঠ বুরহান আঘলানের সৈন্যদের কাছ থেকে যেসব অশ্ব ও যুদ্ধসাজ দখল করে নিয়েছিল সেসব উদ্ধার করেন, এছাড়াও তাদের কাছ থেকে ধন-সম্পদের বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ জিনিস পান। স্বদেশাভিমুখে রওনা দিয়ে তিনি সেদিনই পথে বুরহান আঘলানের সাক্ষাৎ পান, তাঁর প্রত্যেক সৈন্য নিজ নিজ অশ্ব ও অস্ত্র চিনে নেয় এবং ফিরে পায়। সেদিনই তাঁরা একটি গিরি-সংকটে

পৌছার পর বুরহান আঘলানকে সেখানে যাত্রাবিরতি করার জন্য মোহাম্মদ আজাদ প্রস্তাব করেন, কিন্তু কাপুরুষতা ও অযোগ্যতার কারণে বুরহান আঘলান পথে কোন বিলম্বের কথাই শুনলেন না, তাই তাঁরা সেই গিরি-সংকটের মধ্যদিয়ে চলে আসেন। নিশ্চিতভাবেই চেসিজি খানের আমল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত উলুসের কোন পুরুষ তাঁর মত এধরনের শক্তি ও সাহসের অভাব প্রদর্শন করেনি।

যে সময় আমি মোহাম্মদ আজাদকে কাটোর থেকে পাঠাই এবং তিনি সেই দেশটি পরাভূত করতে পারায় আমি সন্তুষ্ট হই— সেই সময় এগিয়ে যাবার জন্য একটি রাস্তা খুঁজে বের করতে এবং আমার যাত্রাবিরতির স্থান পরিষ্কার রাখতে আমি আলী সিস্তানী ও জালালুল ইসলামকে সামনে পাঠিয়ে দেই। এই আদেশের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে তাঁরা সামনে এগিয়ে যান, বিভিন্ন স্থানে রাস্তার উপর থেকে তুষার ও বরফ অপসারণ করেন। আমার জন্য একটি পথ করার পর তাঁরা ফিরে আসেন। আমি তাৎক্ষণিকভাবে অশ্বে আরোহণ করে সামনে রওনা হই এবং আমীর ও সৈন্যরা আমার সাথে পায়দলে যাত্রা করে। অতঃপর আমি বিজয়ের আনন্দ নিয়ে তাঁদের তৈরী করা পথ ধরে খাওয়াক পৌছা পর্যন্ত অগ্রসর হতে থাকি, এখানকার দুর্গে আমি অশ্বগুলোকে ত্যাগ করে গিয়েছিলাম। কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের এই অভিযানে বেরিয়ে আমি আঠারো দিন ধরে (দুর্গে) অনুপস্থিত। আমীর ও সৈন্যরা এ পর্যন্ত পায়ের উপর দাঁড়িয়েই যুদ্ধ করেছেন, তাঁরা এবার তাঁদের অশ্বগুলো ফিরে পেলেন। দুর্গটাকে আমার সৈন্যদের একটি ঘাঁটি হিসাবে গণ্য করে সেখানে অবস্থান করার জন্য একদল লোক রেখে আমি আমাদের ভারী মালপত্র যেখানে রেখে এসেছিলাম সেইদিকে আমার যাত্রা করি এবং সেই দেশের তিলক ঘুনান ও দিকতুরে পৌছি। সেই স্থানে অবস্থানরত শাহজাদা ও আমীরগণ আমার বিজয়ের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে আমার সাথে দেখা করার জন্য বেরিয়ে আসেন। বুরহান আঘলান ও মোহাম্মদ আজাদও আমার এই বিজয়ী শিবিরে এসে আমার সাথে যোগ দেন। অতঃপর আমি আদেশ জারি করি, বুরহান আঘলানকে যেন তারা ভিতরে প্রবেশের অনুমতি না দেয় এবং কোন অবস্থাতেই যেন তিনি আমার সামনে আসতে না পারেন। এটা এ জন্য যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহই ঘোষণা করেছেন, বিশজন সত্যিকার ঈমানদার যদি সাহস ও দৃঢ়তার সাথে কাফেরদের দশগুণ বড় বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে তাহলে তারাই (ঈমানদাররা) ওদের বিরুদ্ধে প্রবল হবে। অথচ বুরহান আঘলান তাঁর নেতৃত্বাধীনে দশহাজার লোক থাকা সত্ত্বেও অল্পসংখ্যক কাফেরদের দ্বারা হত্যাভঙ্গ হয়ে ও পলায়ন করে মুসলমানদের লাঞ্ছনা ও মৃত্যুর কারণ হয়েছেন। অন্যদিকে আমি মোহাম্মদ আজাদকে সম্মান ও লাভ দ্বারা ভরিয়ে দিলাম, তিনি অনেক বেশী সংখ্যক বিধর্মীর বিরুদ্ধে মাত্র চারশত লোক নিয়ে সাহসের সাথে যুদ্ধ করেছেন।

আমি তাঁর পদমর্যাদা সঙ্গীদের উর্ধে উন্নীত করে দেই এবং তাঁর অধীনে একটি সৈন্যবাহিনী অর্পণ করি, এছাড়াও আমি এই বিজয়ের জন্য তাঁর সহগামীদের উপর আমার রাজপুরুষোচিত আনুকূল্য বর্ষণ করতে ছাড়িনি।

আফগানীদের দেশটি জয় ও সেটির ব্যাপার (নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যাপার) সমাধা করে, (পরাজিতদের ফিরে আসার) রাস্তাগুলো সুরক্ষার ব্যবস্থা নিয়ে এবং আফগানীদের বিদ্রোহী লুণ্ঠনকারী গোত্রগুলোকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়ে আমি অশ্বে চড়ি এবং হিন্দুস্তানের দিকে দ্রুত বেগে ধাবিত হই। মাসের ৮ তারিখ শুক্রবার আমি সিন্ধু নদীর তীরে থামি, এই সেই স্থান যেখানে চেঙ্গিজ খানের হাত থেকে বাঁচার জন্য খাওয়ারিজমের সুলতান জালালুদ্দিন সাঁতরে নদী পাড়ি দিয়েছিলেন এবং পিছু ধাওয়া থেকে রেহাই পেয়ে এখানেই তিনি শিবির স্থাপন করেছিলেন। সেখানেই আমি শিবির স্থাপন করি এবং আমার ও সৈন্যদেরকে আদেশ দেই, তাঁরা যেন নৌকা, তক্তা ইত্যাদী সংগ্রহ করে সিন্ধু নদীর উপর একটি সেতু বানিয়ে ফেলে। আমার আদেশের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে তাঁরা সবাই কাজে লেগে যায় এবং দুই দিনের মধ্যেই এই বিশাল নদীর উপর একটি সেতু তৈরী করে ফেলে।

এই সময় দুনিয়ার বিভিন্ন স্থান থেকে দূতেরা এসে উপস্থিত হয়। তাদের স্ব স্ব দেশ ও রাজ্যের সুলতান, শাসক ও প্রধান ব্যক্তির পত্র ও যোগাযোগের ভাষার মর্মার্থ ছিল: “আমরা সব ধরনের আন্তরিকতার সাথে আনুগত্য ও বশ্যতার গলবন্ধনী আমাদের জীবনের গলায় পরিধান করছি এবং গোলামির বোঝা আমাদের পিঠে চাপিয়ে নিচ্ছি। আমরা সবাই মহান সম্রাটের কল্যাণকর আগমনের প্রতীক্ষা করছি উৎকর্ষার সাথে। তাঁর সৌভাগ্যশীল ছত্রছায়ায় সুরক্ষা কবে এই রাজ্যে সুখ আনয়ন করবে এবং কবে তাঁর মহিমময় ও গরিমময় পাদপীঠ চুম্বন করার সম্মান অর্জন করা আমাদের দ্বারা সম্ভব হবে?” সুলতানদের এই ধরনের উপস্থাপনার জবাবে আমি তাঁদেরকে উৎসাহমূলক ফরমান লিখে পাঠাই এবং তাঁদের জন্য দূতদের মাধ্যমে উপহার দিয়ে দূতদেরকে বিদায় জানাই। এমনই একজন দূত হলেন হৈয়দ মোহাম্মদ মাদানী, যিনি এসেছিলেন মক্কা মোকাররমা (প্রশংসনীয়) ও মদীনা মুনাওয়ারা (সৌভাগ্যপ্রাপ্ত)’র প্রধান ব্যক্তির পক্ষ হতে। তাঁকে আমি খুবই সম্মান ও শিষ্টাচার প্রদর্শন করি এবং তাঁদের বিদায়ের আগেই তাঁদেরকে প্রচুর আনুকূল্যে ভরিয়ে দেই। এছাড়াও আমি কাশ্মীরের শাসক ইসকান্দর শাহের দূতকে বিদায়ের আগে একটি অশ্ব ও সম্মানসূচক পোশাক প্রদান করি এবং তাঁর কর্তার জন্য একটি ফরমান দেই যেটাতে বলেছি, আমার বিজয়ী শিবির যখনই দিবালাপুর নগরীতে পৌঁছাবে তখনই তিনি যেন তাঁর বাহিনী নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন। দূতদেরকে বিদায় দিয়ে

মঙ্গলবার ১২ই মহররম ৮০১ হিজরী (২৪শে সেপ্টেম্বর ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দ) আমি সিন্ধু নদী অতিক্রম করে অপর পাড়ে আমার শিবির স্থাপন করি এবং আশেপাশের যেসব জমিদার স্বেচ্ছায় বশ্যতা স্বীকার করেছেন ও আমার সাথে যুক্ত থাকবেন বলে জানিয়েছেন তাঁদের কারো কারো কাছ থেকে রাস্তার ব্যাপারে খোঁজ-খবর করি। তাঁরা নিবেদন করেন যে, একটি রাস্তা গিয়েছে উর্বর ও পানি সহজলভ্য একটি জেলার ভিতর দিয়ে, তবে রাস্তাটি খুবই ঘোরালো ও দীর্ঘ এবং অন্য রাস্তাটি গিয়েছে মূলতানের কাছে চোল-জারাদ^{১০} মরুভূমির মধ্যদিয়ে, এই পথ দিয়ে বহুদিনের ভ্রমণে না পানি, না ভূগভূমি— কোনটাই মিলবে না। এটা চোল-জারাদের মধ্যদিয়ে যাওয়া সেই রাস্তা, চেসিজ খানের হাত থেকে বাঁচার জন্য পলায়নকালে খাওয়ারিজমের সুলতান জালালুদ্দিন সিন্ধু পাড়ি দিয়ে যেটা ব্যবহার করে মূলতান পৌঁছেছিলেন। সেই থেকে এই মরুভূমিকে চোল-ই জালাল নামে ডাকা হয়। এই বিবরণ শোনার পর আমি এই মরুপথ ধরে এগিয়ে যাবার স্থিরসিদ্ধান্ত গ্রহণ করি এবং পুরো সৈন্যবাহিনী যাতে বহুদিনের জন্য পানি ও খাদ্যসামগ্রী অবশ্যই সাথে নেয় তার জন্য আদেশ দেই। এরপর আমি মরুভূমির মধ্যে কয়েকদিনের পথ এগিয়ে যাই। এ সময় পর্বতময় দেশ জুদএর রাজপুরুষ ও রাজারা যথাযথ আস্তরিকতার সাথে আনুগত্য ও বশ্যতার রাস্তায় তাঁদের পা রেখে রাজস্ব ও উপহার সহকারে এসে আমার শিবিরে সংযুক্ত হবার প্রার্থনা জানান, এ সময় তাঁদেরকে সামনে ভূমিতে চূষন করার সুযোগ দিয়ে সম্মানিত করি। এর আগে শাহজাদা রুস্তম— যাকে আমি হামজা আমীর তাঘি বুঘা, অন্যান্য আমীর ও বিশাল সৈন্যবাহিনীসহ মূলতান পাঠিয়েছি— একই রাস্তা ধরে মরুভূমিতে প্রবেশ করে জুদের পাহাড়গুলোর দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন, এ সময় এই রাজপুরুষ ও রাজারা তাঁদের সৌভাগ্যের জন্য তাঁর সামনে উপস্থিত হন এবং স্বেচ্ছায় যথাযথ বশ্যতা স্বীকার করেন ও তাঁর সৈন্যবাহিনীর জন্য রসদ সরবরাহ করেন। সেই থেকে তাঁরা আমার শক্তির প্রতি গোলামি ও আনুগত্যের জোয়ালা তাঁদের আস্তরিকতার গলদেশে পরিধান করে নিয়েছেন। অতঃপর আমি তাঁদের সম্মুখভাগে স্বীকৃতি দেই এবং তাঁদেরকে (আগত ব্যক্তিদেরকে) আনুকূল্যমূলক ফরমান সহকারে বিদায় দিয়ে সামনে পথ চলা শুরু করি। মরুভূমি থেকে মুক্ত হবার পর জামদ (ঝিলাম) নদীর তীরে এসে থামি। তবে আমাকে অবহিত করা হয়েছে যে, এই নদীর মাঝামাঝি স্থানে একটি খুবই শক্তপোক্ত দুর্ভেদ্য দ্বীপ রয়েছে, এর শাসককে শাহাবুদ্দিন নামে ডাকা হয় এবং তিনি যথেষ্ট সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করেছেন। শাহজাদা পীর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর যখন মূলতানের দিকে চলছিলেন তখন এই শাহাবুদ্দিন আনুগত্য ও বশ্যতার সিংহের কোমরে দড়ি লাগিয়ে নিজেকে শাহজাদার সামনে হাজির করেছিলেন এবং গোলামি ও অধীনতার কর্তব্য পালন

করবেন বলে বাহ্যিকভাবে প্রকাশ করেছিলেন। শাহজাদার সামনে কিছু সময় অবস্থান ছাড়াও তিনি তাঁকে রাজস্ব এবং উপযুক্ত উপহারাদি প্রদান করেন। বিদায়ের অনুমতি পেয়ে তিনি স্বস্থানে ফিরে যাবার পর যখন দেখলেন যে, তাঁর দুর্গ শক্তিশালী ও পানিবেষ্টিত এবং তাঁর সৈন্য সংখ্যা প্রচুর, তখনই তাঁকে অহংকারে পেয়ে বসে, অতঃপর তিনি বিদ্রোহের পথে চলে যান ও প্রকাশ্যে বিরোধিতা করতে থাকেন। জামদ নদী থেকে একটি ঝাল কেটে তিনি নগরীর যে পার্শ্বে ইতিপূর্বে পানি ছিলনা সেই পার্শ্বে পানি নিয়ে আসেন, এতে করে তাঁর নগর ও দুর্গের চারপাশেই পানিপূর্ণ একটি পরিখার মত হয়ে যায়। এছাড়াও তিনি সেখানে খাদ্যসামগ্রী ও যুদ্ধ সরঞ্জামের একটি মজুদ গড়ে তোলেন। এইসব শুনার পর আমি তাঁকে পুরোপুরি পরাভূত করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি।

শাহাবুদ্দিনের দ্বীপটি দখল

আমি নিলিখিত উপায়ে কাজটা সম্পন্ন করি। আমি তাৎক্ষণিকভাবে আমীর শেখ নুরুদ্দিনকে তাঁর তুমানদেরকে সাথে নিয়ে এবং অন্যান্য অধিনায়কদেরকে তাঁদের সৈন্যবাহিনী নিয়ে দ্বীপটির দিকে অগ্রসর হতে আদেশ দেই। তাঁদেরকে বলে দেই, যাতে তাঁরা সৈন্যদেরকে আদেশ দেন যে, সৈন্যরা যেন অবশ্যই চলার পথে গাছের ডাল-পালা সংগ্রহ করে নেয় এবং সেগুলো দিয়ে শাহাবুদ্দিনের খননকৃত পরিখা ভরিয়ে দেয়। পরিণামদর্শিতা ও চালাকির মাধ্যমে দ্বীপটি দখল করে তারা শত্রুকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করে দিতে হবে। সেদিনই বুধবার ১৪ই মহররম আমীর শেখ নুরুদ্দিন তাঁর সাহসী সৈন্যবাহিনী নিয়ে শাহাবুদ্দিনের দ্বীপের দিকে বেরিয়ে পড়েন এবং অল্প সময়ের মধ্যে সেখানে পৌঁছে যান। তিনি ও তাঁর সৈন্যরা সেই পরিখার কিনারে নেমে গাছের ডালগুলো ছুঁড়ে মেরে সেগুলোর দ্বারা একটি সেতুর মত বানিয়ে ফেলেন, যার দ্বারা তারা দ্রুত পানি অতিক্রম করে শত্রুর কাছাকাছি স্থানে চলে যেতে সক্ষম হন। তবে সেখানে তাদের জন্য একটি কঠোর প্রতিরোধ অপেক্ষা করছিল। সকাল থেকে শুরু করে মাগরিবের নামাজের সময় পর্যন্ত সারাদিন প্রচণ্ড যুদ্ধের মধ্যে কেটে যায়। রাত নেমে এলে আমীর শেখ নুরুদ্দিন তাঁর সাহসী সৈন্যদের সাথে নিয়ে যেখানে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছিলেন সেই ভূমিটা দখলে রাখেন, এক ইঞ্চিও না ছেড়ে সর্বোচ্চ নজরদারি ও সতর্কতা বজায় রাখেন। হঠাৎ করে শাহাবুদ্দিন ১০হাজার লোক নিয়ে আমাদের সৈন্যদের উপর রাত্রিকালীন আক্রমণ চালান। আমীর শেখ নুরুদ্দিন বিরাট সাহস প্রদর্শন করেন এবং অবিচলিত উদ্যমের সাথে শত্রুর মোকাবেলা করেন। তিনি সেই রাত্রিকালীন আক্রমণের স্রোত শাহাবুদ্দিনের সৈন্যবাহিনীর উপরই ফিরিয়ে দেন, যা অবশেষে তাদের অনেককে ধ্বংসের ধূলিকণার সাথে মিশিয়ে দেয়, অনেকে পালিয়ে যায় এবং পলায়নপর অনেকে সেই পরিখার পানিতে ঝাঁপ দিয়ে মাছের খোঁরাকে পরিণত হয়। আমার প্রাসাদে ক্রীতদাস হিসাবে জন্য নেয়া মনসুর ও বুর্জা চুরা তার ভাইদেরকে সাথে নিয়ে সেই রাতে দুঃসাহসিক উদ্যমের প্রমাণ দেয় এবং প্রচণ্ড আঘাতপ্রাপ্ত হয়। আমার পথ চলতে চলতে শাহাবুদ্দিনের কাণ্ডকীর্তির খবর

পেয়ে আমি নিজেই একটি অভিযান পরিচালনা করি এবং তাঁর (শাহাবুদ্দিনের) দুর্গের পরিখার কিনারে এসে থামি। আমাকে অবহিত করা হয় যে, রাজিকালীন হামলায় শাহাবুদ্দিন প্রচণ্ড প্রত্যাঘাতের সম্মুখীন হয়েছেন এবং তাঁর সবচেয়ে সক্ষম সৈন্যদের প্রচুর সংখ্যক নিহত হয়েছে, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি হতাশ হয়ে তাঁর রাজ্য ও সম্পদ থেকে মন-মানসিকতা তুলে নিয়ে ভগ্ন-হৃদয়ে ও অসহায় অবস্থায় দুইশত নৌকায় আরোহণ করেন। এই ধরনের জরুরী অবস্থার জন্যই তিনি নৌকাগুলো সংগ্রহ করে তাঁর প্রাসাদের কাছে নোঙ্গর করে রেখেছিলেন। আর এভাবেই তিনি নদীর ভাটিতে উচএর দিকে পালিয়ে যান।

এ অবস্থায় আমি এ মর্মে একটি ফরমান জারি করি যে, আমীর শেখ নুরুদ্দিন তাঁর বিশিষ্ট ব্যক্তি ও অধীন লোকজন নিয়ে শাহাবুদ্দিনের পিছু ধাওয়া করে নদীর পাড় দিয়ে এগিয়ে যাবেন। তিনি তাঁর সাহসী বাহিনী নিয়ে দুঃসাহসিকভাবে ধাওয়া করে পলাতকদের কাছাকাছি পৌঁছে যান এবং তাদেরকে লক্ষ্য করে তীর বর্ষণ শুরু করেন, এতে তাদের বিপুল সংখ্যককে হত্যা সফল হন এবং বিজয়ের বিনিময়ে সর্বোচ্চ পুরস্কার অর্জন করেন। তাঁকে আমার পাদপীঠ^{১১} চুম্বনের সম্মান লাভ করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল এবং তিনি যে সাহস দেখিয়েছেন তার পুরস্কার সরূপ তাঁকে আমি আমার রাজপুরস্কোচিত সুযোগ-সুবিধা দ্বারা ভরিয়ে দেই। তাঁর সৈন্যরা— যারা রাতের আক্রমণকালে সাহসের পরিচয় দিয়েছে এবং আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে তাদেরকে আমি নানান আনুকূল্যের নিশানা দ্বারা সম্মানিত করি। আমি আমীর শাহ মালিককে আদেশ দেই, তিনি যেন সৈন্যদের নিয়ে দ্বীপটির প্রত্যেক নিভৃতস্থান ও কোণায় এবং জঙ্গল ও বনগুলোতে তল্লাশী চালান, কোন শত্রুকে সেসব স্থানে আশ্রয়রত পাওয়া গেলে তিনি যাতে তাদেরকে আটক করেন। আমার আদেশের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে তিনি দ্বীপটির প্রত্যেক নিভৃতস্থান ও কোণায়-কোণায় নিখুঁতভাবে তল্লাশী চালান এবং সেখানে আশ্রয় নেয়া বহুসংখ্যক শত্রু ও হিন্দুস্তানী তাঁর নির্মম হত্যার শিকারে পরিণত হয়, তিনি তাদের নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করেন, তাদের ধন-সম্পদসহ বিশাল যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হস্তগত এবং খাদ্যশস্য বোঝাই অনেকগুলো নৌকা আটক করেন। নগরী ও শাহাবুদ্দিনের দুর্গটি জ্বালিয়ে উচ্ছেদ করে এবং মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে তবেই আমি সন্তুষ্ট হই। এরপর আমি সে স্থান ত্যাগ করি এবং জামদ (ঝিলাম) নদীর পাড় ধরে চলতে শুরু করি। ইতিমধ্যে আমি গুনলাম, শাহাবুদ্দিনের নৌবহর মূলতান এলাকার মধ্যে প্রবেশ করার পর শাহজাদা পীর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর এবং আমীর সোলায়মান শাহ (যিনি শাহজাদা শাহরুখের সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন) এর সৈন্যদের বাধার মুখে পড়ে। নৌবহর পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয়া হয় এবং শাহাবুদ্দিন প্রথমে তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদেরকে নদীতে নিক্ষেপ করে পরে নিজে

ঝাঁপিয়ে পড়েন, এভাবে তাঁর পরিবারের সম্পূর্ণ ধ্বংস হবার খবর আমার জন্য খুবই খুশী বয়ে আনে।

পাঁচ বা ছয়দিন পথ চলার পর রবিবার, সেই মাসের ২১ তারিখ, আমি এমন একস্থানে এসে উপস্থিত হই যেখানে জামদ ও চিনাদ (চিনাব) নদী মিলিত হয়েছে, সেখানে একটি দুর্গ ছিল, যেটি তারা বানিয়েছিল দুই নদীর মিলনস্থলে। এখানে আমি থামি এবং এইসব বিশাল নদীর মিলনস্থলে ঢেউ ও পানির আছড়ে পড়া দেখে নিজে নিজে আনন্দলাভ করি, আর এইসব আশ্চর্য ব্যাপার দেখে সর্বশক্তিমান আল্লাহর শক্তির কথা ভাবি। কিন্তু আমি দেখলাম, একটি সেতু বানানো ছাড়া এটা পার হওয়া কঠিন হবে। আমি যখন আমার ও সৈন্যদেরকে একটি সেতু বানিয়ে ফেলার আদেশ দেই, তখন সেখানে উপস্থিত দেশটির কিছু জমিদার ও প্রধান ব্যক্তি আনত হয়ে বললেন, এই ধরনের প্রবল ও উখাল-পাখাল স্রোতের উপর দিয়ে সেতু তৈরী করা অসম্ভব, যখন তারমশারিন খান এসেছিলেন তখন তিনি এই নদীর উপর সেতু তৈরীর জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালালেও তা যথেষ্ট হয়নি এবং অবশেষে তিনি নৌকা যোগে নদী পার হতে বাধ্য হন, তাই এখন মহান সম্রাটেরও নৌকা যোগেই তাঁর সৈন্যবাহিনীকে পার করা সমীচীন। আমি তাঁদেরকে বললাম, আমি যদি দেখি যে, আমি সেতু বানাতে অক্ষম, তাহলেই আমি তাঁদের দেখানো মতে পার হব। আমি তৎক্ষণাৎ আদেশ দিলাম যাতে সেতু বানানোর জন্য আমার পুরো সৈন্যবাহিনী অবশ্যই কাজ শুরু করে দেয়। সে মতে, নৌকা যোগাড় করে, একটিকে অপরটির সাথে শিকল ও মোটা দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে এবং পানির মধ্যে কাঠদণ্ড পুঁতে তারা একটি সেতু বানিয়ে ফেলে। আর এসবই যথেষ্ট শক্তিশালী করে সম্পন্ন হয়েছিল ছয় দিনে। সেই দিনটি ছিল বুধবার, সেই মাসের ২৮ তারিখ। ঘোড়ার পিঠে চড়ে আমি নদী পার হই এবং নির্দেশ দেই যে, আমার বহু বিভাগে বিভক্ত সৈন্যবাহিনী একের পর এক পার হবে। মালপত্র ও সৈন্যদের পার হওয়ার জন্য আমি সেই নদীর তীরে আরেকটি দিন থামলাম।

আমার সমস্ত সৈন্য পাড়ি দিয়ে এলে আমি সন্তোষ সহকারে সামনে চলতে শুরু করি এবং তুলাম্বা নগরীতে পৌঁছার পর সেখানে নদীর তীরে শিবির স্থাপন করি। তুলাম্বা নগরীটি মুলতান থেকে ৭০মাইলের মত দূরে। সেইদিনই তুলাম্বা নগরীর সাইয়্যিদ, আলেম, শেখ, প্রধান প্রধান ব্যক্তি ও শাসকগণ আমার সাথে দেখা করার জন্য আসেন এবং আমার ঘোড়ার জিনের রেকাব চুম্বনের সম্মান লাভ করেন। যেহেতু তাঁদের সবার কপালে আন্তরিকতার কথা পরিস্কারভাবে লেখা ছিল, তাই তাঁদের প্রত্যেককে পদমর্যাদা অনুযায়ী আমার রাজপুরুষোচিত আনুকূল্য দ্বারা সম্মানিত করি।

সামনে চলতে চলতে আমি শনিবার ১লা সফর তুলাস্বা দুর্গের সামনের সমতল ভূমিতে থামি। আমার উজিররা এই নগরীর লোকজনের উপর উদ্ধারমূল্য (হামলা চালানো হবে না- এই শর্তে) দুইলাখ রুপী নির্ধারণ করে দেন এবং সংগ্রহকারী নিযুক্ত করেন, তবে সাইয়্যিদগণ- যাঁরা আমাদের নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)এর বংশধর- তাঁরা এবং ইসলামের আলেমগণ- যাঁরা আমাদের নবী (সাঃ)এর উত্তরাধিকারী- তাঁরা সবসময়ই আমার দরবারে সম্মান পেয়ে থাকেন এবং তাঁদেরকে খুবই ভক্তি ও সম্মান দেখানো হয়, তাই আমি আদেশ দেই যে, তুলাস্বার নাগরিকদের কাছ থেকে উদ্ধারমূল্য (মুক্তিপণ) আদায় করা হবে, তবে সাইয়্যিদ ও আলেমগণের জন্য যা লেখা হয়েছে তা হিসাব থেকে বাদ দেয়া হবে। মূল্যবান সম্মানী পোশাক ও আরবীয় অশ্ব উপহার দেবার মাধ্যমে তাঁদের অন্তরকে আনন্দ ও সাফল্য দ্বারা ভরিয়ে দিয়ে তাঁদেরকে আমি বিদায় দেই। এসময় একটি অতিরিক্ত সৈন্যদল এসে পৌছায়, এতে আমার সৈন্যবাহিনী পিঁপড়া ও পঙ্গপালের গোত্রের চেয়েও আরো অনেক বড় আকার ধারণ করে, যা খাদ্যাভাবের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে আমার শিবিরে খাদ্যাভাব দেখা দেয়, যদিও নগরীর জনগণের কাছে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য ছিল। যেহেতু উদ্ধারমূল্যের (মুক্তিপণ) একটি অংশ- যা মুদ্রা দ্বারা পরিশোধের কথা ছিল- তা তখনো পর্যন্ত সংগ্রহ করা হয়নি, আর এদিকে আমার সৈন্যরা খাদ্যাভাবের দরুন দুর্দশায় পড়েছিল, তাই নগরীর লোকেরা যাতে টাকার বদলে খাদ্যশস্য দ্বারা উদ্ধারমূল্য পরিশোধ করে আমি তার আদেশ জারি করি। কিন্তু তারা আমার সৈন্যদের দুর্ভোগের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীনতা দেখিয়ে তাদের খাদ্যশস্য নিজেদের কাছে জমা করে রাখার ব্যাপারে জেদ ধরে। ক্ষুধার্ত তাতাররা তাদের উপর পিঁপড়া ও পঙ্গপাল নিধনের মত ব্যাপক হামলা চালায়, বহু সংখ্যক খাদ্যের গোলা লুণ্ঠন করে। এত বেশী সংখ্যক গোলা লুণ্ঠনের শিকার হয় যে, সংখ্যা গুনে বলা সম্ভব নয়। “নিশ্চয়ই, বাদশাহরা যখন কোন নগরীতে প্রবেশ করেন, তখন তা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেন”- এই প্রবাদ অনুযায়ী ক্ষুধার্ত তাতাররা নগরীটিতে ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে থাকে- যতক্ষণ না সেই ধ্বংসযজ্ঞের জনরব আমার কাছে পৌঁছে। সৈন্যদেরকে নগরী থেকে বের করে দেবার জন্য আমি আমার সিয়াওয়াল ও তাওয়াচিদেরকে নির্দেশ দেই এবং যা কিছু শস্য ও অন্যান্য সম্পদ লুণ্ঠন করা হয়েছে তা যেন সেই পরিমাণ উদ্ধারমূল্য হিসাবে গ্রহণ করা হয় (অর্থাৎ মোট উদ্ধারমূল্য থেকে তা যেন বাদ দেয়া হয়) তারও আদেশ দেই। এই সময় আমাকে অবহিত করা হয় যে, শাহজাদা পীর মোহাম্মদ মুলতানের দিকে যাবার সময় তুলাস্বার আশেপাশের কিছু প্রধান জমিদার তাঁর সামনে হাজির হয়ে আনুগত্য ও বশ্যতার পথে হেটেছিলেন কিন্তু যখন তাঁদেরকে বিদায় দেয়ার পর তাঁরা নিজ নিজ আবাসে ফিরে গিয়ে

অবাধ্যতা ও বিদ্রোহের মহাসড়কে পা রেখেছেন। আমি তাৎক্ষণিকভাবে আমীর শাহ মালিক ও আইকু তৈমুরের পুত্র শেখ মুহাম্মদকে তাঁদের তুমান ও কুশনদেরকে নিয়ে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যাত্রা করে তাদের উপর যথোপযুক্ত শাস্তি র আঘাত হানার আদেশ দেই। আমীর শাহ মালিক ও শেখ মোহাম্মদ তাঁদের সাথে একজন পথপ্রদর্শক নিয়ে তৎক্ষণাৎ দ্রুত পথ চলা শুরু করে দেন এবং এইসব হতভাগা ও সৌভাগ্য কর্তৃক পরিত্যক্ত ব্যক্তির যে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছিল সেখানে উপস্থিত হন। তাঁরা অশ্বের পিঠ থেকে নেমে জঙ্গলে প্রবেশ করে তাঁদের নিষ্ঠুর খড়্গ (বাঁকা তরবারী) দিয়ে এইসব দুর্ভাগ্যকবলিত হিন্দুস্তানীদের দুই হাজার জনকে কেটে হত্যা করেন, তাদের নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করেন এবং গরু, মহিষ ও অন্যান্য সম্পদের বিশাল যুদ্ধলব্ধ সম্পদসহ ফিরে আসেন। বিজয়ীরবেশে ফিরে এসে তাঁরা তাঁদের জয় করা লুঠের মালগুলো আমার সামনে প্রদর্শন করেন। সেগুলো সৈন্যদের মাঝে বন্টন করে দেয়ার জন্য আমি আদেশ দেই। এইসব হতভাগাকে খতম করে আমার মন যখন তুষ্ট, তখন শনিবার এই সফর আমি অশ্বের জিনের রেকাবে পা রাখি এবং তুলাম্বা থেকে যাত্রা শুরু করি। শাহপুরের বিপরীতে বিয়াহ নদীর পাড়ে জাল নামকস্থানে এসে আমি থামি। আমাকে অবহিত করা হয় যে, এই দেশে খোখার গোত্রে নুসরাত নামে একজন জমিদার রয়েছে, সে একটি হ্রদের পাড়ে দুই হাজার রক্তপিপাসু সৈন্য নিয়ে একটি দুর্গের মধ্যে অধিষ্ঠিত হয়ে ঔদ্ধত্য ও বিদ্রোহ প্রদর্শন করছে। একদল লোককে রেখে আমি এই নুসরাত খোখারকে আক্রমণ করার জন্য তৎক্ষণাৎ রওনা হই।

নুসরাত খোখারকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করার বিবরণ

একদল বাছাইকরা লোকের সাথে মালপত্র পিছনে রেখে আমি যাত্রা শুরু করি। আমি সৈন্যবাহিনীর ডানদিকের অংশের সেনাপতি নিযুক্ত করি আমীর শেখ নুরুদ্দিন ও আমীর আল্লাহদাদকে এবং বামদিকের অংশের নেতা ছিলেন আমীর শাহ মালিক ও আমীর শেখ মোহাম্মদ। আমার রণবহরের সম্মুখভাগের দায়িত্ব খোরাসানী পদাতিক সৈন্যবাহিনীসহ আলী সুলতানের উপর ন্যস্ত করে আমি মধ্যখানে অবস্থান গ্রহণ করি। আমি যখন হৃদের তীরে সাংঘাতিক সেই জলাভূমিতে এসে পৌঁছি— যেখানে আল্লাহ কর্তৃক পরিত্যক্ত সেই নুসরাত তার অবস্থান গ্রহণ করেছিল— আমি দেখলাম যে, সে সেখানে তার দুই হাজার লোকসহ আমাকে মোকাবেলা করার জন্য সুসজ্জিত অবস্থায় রয়েছে। আলী সুলতান তাঁর খোরাসানী সাহসী পদাতিক বাহিনী নিয়ে তৎক্ষণাৎ জলাভূমিতে ঢুকে পড়ে সেইসব নাপাক (অপবিত্র) হিন্দুস্তানীর উপর আক্রমণ চালিয়ে জলাভূমির অর্ধেকটা পর্যন্ত এগিয়ে যেতে সফল হন এবং যদিও তিনি ও তাঁর বহুলোক মারাত্মকভাবে আহত হন তথাপি তাঁরা তেজস্বী লড়াই চালিয়ে যান। তাঁকে সহায়তার জন্য আমীর শেখ নুরুদ্দিন ও আমীর আল্লাহদাদকে তাঁদের ডানদিকের সৈন্যসহ তক্ষুণি এগিয়ে যেতে আমি আদেশ দেই এবং যত দ্রুত সম্ভব তাঁরা জলাভূমির অসুবিধা কাটিয়ে ওঠার সাথে সাথে নুসরাত ও তার লোকজনের উপর পূর্ণশক্তি নিয়ে আঘাত হানেন। নুসরাত ইতিমধ্যেই দুরবস্থায় পতিত হয়েছিল, সে এবার এই দ্বিতীয় আক্রমণের সামনে দাঁড়াতে সম্পূর্ণ অক্ষম হয় এবং ব্যাপক হত্যাযজ্ঞের মধ্যদিয়ে উচ্ছেদ হয়ে যায়। নুসরাত নিজেও (সম্ভবতঃ) নিহতদের মাঝে পড়ে ছিল, তবে সে কিভাবে নিহত হয় তা অথবা সে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল কিনা তা জানা যায়নি। আমার বিজয়ী বাহিনী নুসরাত খোখারের আবাসে প্রবেশ করে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং ঐসব হিন্দুস্তানীর সম্পদ-সম্পত্তি লুণ্ঠন করে পাখির ঝাঁক, পশুর পাল ও মহিষ ইত্যাদীর এক প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আমার সামনে উপস্থিত করে। আমি তৎক্ষণাৎ সেই স্থান ত্যাগ করি এবং বিয়াহ নদীর তীরে একটি জমবহুল গ্রাম শাহনওয়াজে থামি; সেখানে ভাণ্ডার ও খাদ্যের

গোলাগুলোতে প্রচুর পরিমাণ শস্য জমা করে রাখা ছিল। আমি ও আমার সৈন্যরা যে যত পারলাম নিলাম এবং এরপর যা অবশিষ্ট থেকে গেল সে সবে গোলাসহ আশুন লাগিয়ে দেবার জন্য আমি আদেশ দিলাম। নুসরাতের কিছুসংখ্যক অনুসারী বিয়াহ নদী পাড়ি দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল, তাই তাদের পিছু ধাওয়া করার জন্য আমার সাহসী সৈন্যবাহিনীর একটি অংশ সেদিকে পাঠিয়ে দেই। আমার সৈন্যরা নদী পার হয়ে সেই পলায়নপর সৈন্যবাহিনীকে ধরে ফেলে তাদের ব্যাপক সংখ্যককে হত্যা করে এবং বহু বন্দী ও প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদসহ ফিরে আসে। মঙ্গলবার, মাসের ১৩ তারিখ আমি শাহনওয়াজ থেকে আমার মালপত্র যেখানে রেখে এসেছিলাম সেদিকে যাত্রা শুরু করি এবং জানজানের বিপরীত দিকে বিয়াহ নদীর তীরে গিয়ে আমার শিবির স্থাপন করি। সেখানেই আমার সমস্ত ভারী মালপত্র ও সরবরাহ যোগাড় রাখা হয়েছিল। আমি পুরো সৈন্যবাহিনী ও মালপত্র জানজান নদী পার করে ফেলার এবং শহরের বাইরে যেখানটায় একটি সবুজ-শ্যামল বাগান রয়েছে সেখানে অল্প উচ্চতায় আমার তাঁবু স্থাপন করার আদেশ প্রদান করি। তারা তা সম্পন্ন করার পর আমি নিজে নদী পাড়ি দেই এবং কিছুটা উচ্চতায় আরোহণ করি, যেখান থেকে একটি সবুজ সুখকর সমতল ভূমি আমার নজরে পড়ে। যোহরের নামাজ আদায় করার জন্য আমি তাঁবুতে ফিরে যাই। এরপর পীর মালিক নামের শাহজাদা শাহরুখের এক কর্মচারী খোঁরাসানের শাহজাদার কাছ থেকে আনা কয়েকটি পত্র আমাকে দেয়। এসব পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে আমি তাঁর মঙ্গল কামনা করি এবং দেশটি তাঁর তত্ত্বাবধানে অর্পণ করার নিশ্চয়তা দেই।

মুলতান বিজয়ের খবর আসার বিবরণ

এই একই সময়ে আমার সৌভাগ্যবান পুত্র পীর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর ও অন্যান্য আমীরগণ— যাঁরা মুলতান অবরোধ করেছিলেন— তাঁদের কাছ থেকে খবর আসে যে, “আল্লাহর অনুগ্রহে ও বাদশাহর সৌভাগ্যের জোরে আমরা ছয় মাস ধরে মুলতান অবরোধ করে রাখার পর বিজয় মুখ তুলে চেয়েছে। মুলতানের শাসক সারাজকে তাঁর সৈন্যবাহিনী ও লোকজন সমেত এমন একটি গিরিসংকটে (দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ স্থান) আটকে ফেলি যে, সেখানে খাওয়ার কিছুই নেই, এমনকি তাদের নগরীতে একটি বিড়াল বা হুঁদুরও আর জীবিত নেই। সারাজ যখন নিজেকে খাদ্যাভাব জনিত এমন চরম দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় আটক দেখতে পায়, তখন কেবলই দুর্বলতা ও ক্লান্তি হেতু বাধ্য হয়ে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে কেবলমাত্র নিজের জীবন বাঁচানোর ব্যাপারে দরকষাকষি শুরু করে। এই এক শর্ত— যা উপরে বলা হয়েছে— মঞ্জুর করার পর সে নগরী থেকে বেরিয়ে আসে এবং তা আমাদের হাতে তুলে দেয়। ইত্যবসরে বর্ষাকাল শুরু হয়ে যায়, মুঘলধারে বৃষ্টিপাত চলতে থাকে, যার ফলে আমার নিজের আস্তাবলের বেশীরভাগ অশ্ব এবং আমীর ও সৈন্যদেরও ব্যাপক সংখ্যক অশ্ব মৃত্যুবরণ করে। প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতের দরুন আমরা আমাদের শিবির নগরীর মধ্যে সরিয়ে নিতে বাধ্য হই। এইভাবে কিছু সময় পার হয়ে যাবার পর আমাদের মাঝে যখন অশ্বের সংকট চলছে, তখন আশেপাশের জমিদার ও সর্দাররা— যাঁরা আনুগত্য ও বশ্যতার পথ ধরে পরাভব মেনে নিয়েছিল এবং আমাদের সেবায় নিয়োজিত হবার প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল, তাঁরা যখন আমাদের সুস্পষ্ট দুর্দশা দেখতে পায় তখন তাঁরা সবাই আনুগত্যের মহাসড়ক থেকে তাঁদের পা সরিয়ে নেয় এবং এইসব বিশ্বাসঘাতক প্রধানদের অনেকেই নিজেদের উপর মৃত্যুকে টেনে নেয়। এখন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যে, যখন আমাদের অশ্বের মড়ক ও জমিদারদের বিদ্রোহভাবাপন্ন আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও দুর্দশাগ্রস্ত, তখন মহান বাদশাহর বিজয়ী পতাকার আগমনের খবর দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে, যা তাঁর এই ভৃত্যদের অন্তরে আনন্দ এনে দেয় এবং এই দুরাত্মা শত্রুদেরকে তাদের

শয়তানির জন্য অনুশোচনা করতে তাড়িত করে। আমরা আমাদের পেশ করা এই আবেদনপত্রের সাথে সাথে সমুজ্জ্বল দ্বারপ্রান্তের দিকে (বাদশাহর কাছে) ঘনিষ্ঠভাবে এগিয়ে যাব।” পীর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে আসা এই পত্রটি পাঠ করার পর আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করি এবং পরদিনই শাহজাদা কাছাকাছি এসে পৌঁছেছেন বলে খবর পেয়ে শাহজাদা ও আমীরদের প্রত্যেকের জন্য প্রচুর খাদ্য ও রসদসামগ্রী পাঠিয়ে দেই। আমি আরো আদেশ দেই যে, আমার অশ্বের জিনের রেকাবের সাথে সহগামী সব আমীর যেন সামনে এগিয়ে গিয়ে শাহজাদা পীর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীরকে সম্মান জানান এবং সব আমীর ও সৈন্যবাহিনী, তুমান-তুমান, কুশন-কুশন পর্যন্ত সবাই এগিয়ে গিয়ে তাঁর সাথে মিলিত হন। কথামত কাজ হবার পর শাহজাদা নিজেকে আমার সামনে উপস্থিত করেন। প্রথমে আমি শাহজাদা মোহাম্মদ জাহাঙ্গীরকে ডেকে পাঠাই এবং সূত্রে তাঁকে আলিঙ্গন করে আমার সামনে বসার একটি স্থান দেই। এরপর আমি আমীরদেরকে প্রবেশ করতে দেয়ার আদেশ দান করি, তাঁরা এসে জানু পেতে বসে এবং আমাকে সালাম দেয়। এরপর মুশক-বাশি ও যুঝ-বাশিদেরকে আসতে দেয়ার আদেশ দেই এবং তাঁদের সবাইকে আমি সালাম জানাই। অতঃপর শাহজাদাকে সাথে নিয়ে আমি আমার ব্যক্তিগত তাঁবুতে প্রবেশ করি এবং অন্যান্য আমীরদেরকে বাইরে অবস্থানরত রাখি। তাঁরা মূলতান যুদ্ধে যে কঠোর পরিশ্রম করেছেন ও ক্রান্তি অনুভব করেছেন তা আমি লাঘব করার চেষ্টা করি এবং অমায়িক কথাবার্তার পর আমি তাঁদেরকে তাঁদের তাঁবুতে ফিরে যেতে বিদায় জানাই। তবে শাহজাদা পীর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীরকে আমার সাথে রেখে সৈন্যবাহিনীর অবস্থা ও প্রত্যেক আমীরের আচরণ, প্রত্যেকের সেবাদান- যা তাঁরা দিয়েছেন, একই সাথে তাঁদের দিক থেকে কোন ধরনের কাপুরুষতা ও ত্রুটি ছিল কিনা সেসব বিষয়ে বিস্তারিত তদন্ত চালাই। আমি প্রত্যেক প্রশ্নেরই সন্তোষজনক জবাব পাই এবং সৈন্যবাহিনীর আচরণ, যুদ্ধ পরিচালনা, সুলায়মান পর্বত বিজয় সম্পর্কে বিশেষভাবে, একই সাথে দেশটি লুণ্ঠনের ব্যাপারে, সিঙ্কুনদীর গতিপথ, উচ্ নগরী বিজয়, মূলতান অবরোধের বিস্তারিত, মোল্লা খানের ভাই সারাজের পরাজয় এবং আরো নানানরকম বিষয়ে আমি যা যা জানতে চেয়েছি তিনি আমাকে সবধরনের খবরই জানান, যা শুনে তবেই আমি ঘুমাতে যাই। মূলতান জয়ের জন্য শাহজাদাকে আমি একটি খেতাব ও অন্যান্য আনুকূল্য দিয়ে পুরস্কৃত করি, তাঁকে অত্যধিক আনন্দে ভরিয়ে তুলি এবং তাঁর অধীনে যে আমীররা খুবই ভালো সেবা দান (কর্তব্য পালন) করেছেন তাঁদেরকে আমি রাজপুরুষোচিত সুবিধাদি ও আনুকূল্য প্রদান করে সম্মানিত করি। খাওয়ারিজমের বিরুদ্ধে অভিযানকালে জাহান শাহ’র সৈন্যবাহিনী ত্যাগ করে হিন্দুস্তানে পালিয়ে যাওয়া কিছু প্রধান

কয়েকদফা বিদ্রোহ দেখিয়ে মহাদুর্দশায় পতিত হয় এবং পীর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীরের মূলতান অবরোধকালে তারা তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে আশ্রয় চায়, যা তিনি সহৃদয়চিন্তে অনুমোদন করেন। শাহজাদা যখন আমার শিবিরে এসে উপস্থিত হন তখন তিনি তাদের জন্য আমার ক্ষমা চেয়ে অনুনয় বিনয় করেন এবং তাঁদের প্রাণ রক্ষার একটি আবেদনপত্রসহ তাঁদেরকে আমার সামনে হাজির করেন। তাঁকে খুশী করার জন্য আমি তাদের অপরাধ উপেক্ষা করতে রাজি হই এবং তাদের পায়ের তলায় বেত্রদণ্ড প্রদানের পর তাদেরকে ছেড়ে দেবার আদেশ প্রদান করি।

শনিবার, ১৫ই সফর, আমি আমার সৈন্যদেরকে ও মালপত্র বিয়াহ নদী পার করার আদেশ জারি করি এবং আমি নিজে পার হয়ে এসে থামি জানজানে-জায়গাটি মূলতান থেকে আট মাইল দূরে বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আমার সৈন্যদের নদী পাড়ি দেয়া সম্পন্ন করতে সময় দেয়ার জন্য এই স্থানে আমি চারদিন থামি। এখানে শাহজাদা পীর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর একটি বহুমূল্য আমোদ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন এবং আমাকে মূল্যবান উপহারাদি প্রদান করেন, যেমন রাজমুকুট, কারুকার্যখচিত কটিবন্ধ, টাকা, অমূল্য রত্নখচিত অলংকার, আরবীয় অশ্ব, স্বর্ণ ও রত্নখচিত অশ্বের জিনের কাপড়, নানান ধরনের সুন্দর সুচিকর্ম করা কাপড়-চোপড়, বহুমূল্য দুষ্প্রাপ্য জিনিসপত্র এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের কাজ করা নানান নমুনা, যেমন বাসনপত্র, খাদ্য রাখার পাত্র, ঢাকনা, সুন্দর কারুকার্যখচিত পানীয় রাখার নলযুক্ত পাত্র ও কলসী। এগুলো পরিমাণে এত বেশী ছিল যে, এগুলোর বিস্তারিত ফর্দ তৈরী করতে আমার অনুচরবর্গের মধ্যে যত লিপিকার ছিল তাদের সবার পুরো দুইদিন লেগে যায়। এগুলোর পরিদর্শনে গিয়ে আমি সভায় উপস্থিত আর্মীর এবং অন্যান্যদের মাঝে এগুলো বন্টন করে দেই, সবাই যাতে অন্তর্ভুক্ত হয় সে ব্যাপারে আমি যত্নবান ছিলাম।

শাহজাদা পীর মোহাম্মদের সৈন্যবাহিনীতে আমার ৩০ হাজার অশ্ব উপহার দেয়ার বিবরণ

যেহেতু শাহজাদা পীর মোহাম্মদের আমীর ও সৈন্যরা বর্ষার সময় তাঁদের সব অশ্ব হারিয়েছিলেন, তাঁরা তাঁদের পথচলায় প্রচুর কষ্ট ও ক্লান্তি অনুভব করেছেন এবং আমার শিবিরে যখন তাঁরা নিজেদেরকে উপস্থিত করেছিলেন তখন কেউ এসেছিলেন পায়ে হেঁটে, কেউ এসেছিলেন ঝাঁড়ের পিঠে চড়ে, তাই আমি আমার অশ্বশালার অধিনায়ককে ৩০ হাজার যুদ্ধের অশ্ব পেশ করার আদেশ দেই, যা শাহজাদা পীর মোহাম্মদকে উপহার দেই। এভাবে আমি তাঁর পুরো সৈন্যবাহিনীকে নতুন অশ্বের যোগান দিয়ে সজ্জিত করে দেই।

আমার সমস্ত সৈন্য যখন কেউ নৌকা যোগে ও কেউ সাঁতরে বিয়াহ নদীর সেই পথটি পাড়ি দিয়ে এলো, তখন আমি জানজান থেকে সামনের দিকে পথ চলি এবং সাহওয়ালা পৌছি। শুক্রবার, ২১শে সফর স্থানটি ত্যাগ করে আমি আসওয়ানে পৌছি, যেখানে আমি একদিন থামি, পরদিন আমার পথ চলা চালিয়ে গিয়ে আমি জাহওয়ালা পৌছি। সেখানে আমার শিবির স্থাপন করি। এখানে আমাকে অবহিত করা হয় যে, দিবালাপুর নগরীর জমিদার ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সর্বপ্রথম মূলতানে এসেছিলেন এবং শাহজাদা পীর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীরের কাছে আনুগত্যের প্রস্তাব পেশ করে সেখানে একজন প্রশাসক নিয়োগ করার জন্য তাঁর কাছে মিনতিভরা আবেদন জানিয়েছিলেন। তাদের অনুরোধ রক্ষা করে তিনি মুসাফির কাবুলীকে দিবালাপুরের দারোগা নিযুক্ত করেন এবং তাঁকে এক হাজার সৈন্যের নেতৃত্ব তুলে দেন, কিন্তু বর্ষাকালে যখন সৈন্যবাহিনীর অশ্বগুলো অনুপযোগী হয়ে পড়ে তখন দিবালাপুরের জনগণ ফিরোজ শাহ'র কর্মচারীদের সাথে এক ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়ে মুসাফির কাবুলীর উপর হঠাৎ আক্রমণ চালায়, তিনি এই ধরনের বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপারে অপ্রস্তুত ছিলেন। আক্রমণকারীরা তাঁকে এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন একহাজার লোককে হত্যা করে, তবে (আমার সংবাদদাতা বলছেন) এখন মহান বাদশাহ (তৈমুর) এই দেশগুলোকে তাঁর সফরের সম্মান দান করায় ঐসব বিদ্রোহী নগরী ছেড়ে ভাটনির দুর্গে আশ্রয় নিয়েছে। এটি হিন্দুস্তানের অন্যতম সবচেয়ে প্রসিদ্ধ নগরদুর্গ এবং দুর্গের রাজা একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, পুরো দেশে তিনি বিখ্যাত।

ভাটনিরের নগরদুর্গ দখলের বিবরণ

এই বর্ণনা শুনে আমার ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠে এবং আমি আমীর শাহ মালিক ও দৌলত তৈমুর তাওয়াচিকে একটি বিশাল সৈন্যবাহিনীসহ দিবালাপুরের পথ ধরে দিল্লীর দিকে এগিয়ে যাবার জন্য নিযুক্ত করি এবং দিল্লীর পার্শ্ববর্তী সামান্যতে গিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করার আদেশ দেই। আমি নিজে ইত্যবসরে দশ হাজার বাছাইকরা অশ্বারোহীর একটি বাহিনী নিয়ে ভাটনিরের দিকে অগ্রসর হই। আজোধনে পৌঁছে আমি দেখতে পাই, এই স্থানের শেখদের মধ্যে (এদের এই শেখ নামটিই কেবল ছিল, ধর্মের প্রতি কোন ধরনের ভক্তি বা আসক্তি কোনটাই তাদের ছিল না) মানুষ নামের এক শেখ নগরীর কিছু লোককে ফুসলিয়ে নগরী ত্যাগ করিয়ে তার সাথে দিল্লীর দিকে নিয়ে যায়, সেই সময় অন্য লোকেরা শেখ সা'দএর প্রচারণায় প্রলুব্ধ হয়ে ভাটনিরে চলে যায় এবং একদল আলেম (ধর্ম বিষয়ে পণ্ডিত) ও ফকীহ (ইসলামের আইন-কানুন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ)– যারা সবসময় তকদিরের (ভাগ্যের ভালোমন্দের) রাস্তায় নিজেকে সমর্পণের পদযুগল খুব শক্তভাবে স্থির করে রাখেন– তাঁরা তাঁদের স্থান ত্যাগ করেননি, বরং শান্তভাবে নিজ নিজ বাড়িতে অবস্থান করেছেন। পার্শ্ববর্তী আজোধনে আমার আগমনের সাথে সাথে তাঁরা দ্রুত এগিয়ে এসে আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং আমার পাদপীঠ (পা রাখবার চৌকি) চুম্বন করার সৌভাগ্য লাভ করেন, আমি তাঁদেরকে অনেক অনেক ইজ্জত-সম্মান দেখানোর পর বিদায় জানাই। এই নগরীর জনগণ যাতে আমার সৈন্যদের দ্বারা কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তা দেখার জন্য আমি আমার দাস নাছির উদ্দিন ও শাহাব মোহাম্মদকে নিয়োগ করি। হযরত শেখ ফরিদ গঞ্জ-শাকর (তাঁর উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক)এর রহমতপ্রাপ্ত কবর এই শহরেই অবস্থিত বলে আমাকে জানানো হলে আমি তৎক্ষণাৎ সেই মাজার জেয়ারতের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ি। আমি সেখানে ফাতেহা পাঠ করি, সহায়তা ইত্যাদী চেয়ে প্রার্থনা করি এবং তাঁর রহমতপ্রাপ্ত রুহমোবারকের কাছে বিজয় চাই। আমি সেই পবিত্র মাজারের খাদেমদের মাঝে প্রচুর পরিমাণে দান-খয়রাত বিতরণ করি। আমি বুধবার, মাসের ২৬ তারিখ আজোধন ত্যাগ করে ভাটনিরের

পথে যাত্রা করি এবং রুদানাহ অতিক্রম করে দশ ক্রোশ দূরে খালিস কোটালিতে থামি। এইস্থানে আমি ভাটনির দুর্গের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিই। দেশটির জনগণ আমাকে জানায়, ভাটনির ৫০ মাইলের মত দূরে, এটি এমনই প্রচণ্ড শক্তিশালী ও উত্তমভাবে সুরক্ষিত একটি স্থান যে, সারা হিন্দুস্তান জুড়ে এটি বিখ্যাত। সেখানকার বাসিন্দারা যে পানি ব্যবহার করে তা আসে একটি জলাধার থেকে, যেটি বর্ষাকালে বৃষ্টির পানি দ্বারা পূর্ণ হয় এবং সারা বছর পানির যোগান দেয়।^{১২} চারপাশে বহু ক্রোশ ব্যাপী মরুভূমি বেষ্টিত এবং সেখানে পানি পাওয়া যায় না। আজোধন থেকে পালিয়ে আসা লোকজন ভাটনিরে এসেছিল, কারণ ইতিপূর্বে কোন শত্রু বাহিনীই সেখানে অনুপ্রবেশ করেনি। অতঃপর দিবাণপুর ও আজোধন থেকে প্রচুর ধন-সম্পদ ও মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে লোকজনের এক বিশাল সমাবেশ ঘটেছিল সেখানে। শহর ও দুর্গ পরিপূর্ণ ছিল, অনেকে নগরীতে থাকার জায়গা পাচ্ছিল না এবং তারা তাদের ধন-সম্পদ ও মালামাল নিয়ে নগরীর বাইরেই রয়ে যায়, যার ফলে রাস্তাগুলো লোকের ঠাসাঠাসিতে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে প্রচুর সংখ্যক গবাদিপশু পাওয়া যায়।

ঐ স্থানের রাজাকে ডাকা হয় দুল চাইন।^{১৩} তিনি একদল রাজপুতের সন্নিবেশ ঘটিয়েছিলেন, রাজপুতরা হচ্ছে এমন এক শ্রেণী যারা হিন্দুস্তানে সবচেয়ে নামকরা সৈন্য সরবরাহ দিয়ে থাকে এবং এই বাহিনী নিয়ে তিনি যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি সহকারে অপেক্ষা করতে থাকেন। আমি ভাটনির সম্পর্কে সবকিছু নির্ণয় করার পর যোহরের (দুপুরের) নামাজান্তে অশ্বের পিঠে সওয়ার হই এবং খালিস-কোটালি থেকে বেরিয়ে পড়ি। দিনের বাকী অংশ ও পুরো রাত আমি পথ চলতেই থাকি, মরুভূমি পাড়ি দেয়া এবং সকাল হওয়া পর্যন্ত আমি কোথাও বিশ্রাম গ্রহণ করিনি। আমি একটি অগ্রবর্তী গ্রহরীদল পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, তারা শত্রুর অগ্রভাগের সৈন্যদের দ্বারা বহুবার হামলার শিকার হয়। শত্রুদেরকে উৎখাত করে ও তাদের দুইজনকে হত্যা করে শেখ দরবেশ খুবই সাহসের পরিচয় দেন। দুল চাইনের অগ্রবর্তী বাহিনী তখন পশ্চাদপসারণ করে। আমি আমার যাত্রা অব্যাহত রাখি এবং সকালবেলা ভাটনির পৌছি। আমি বাদ্য বাজাবার আদেশ দেই। যন্ত্রগুলো বেজে ওঠে এবং যুদ্ধের শোর-চিৎকার উচ্চকিত হয়। এর অল্পপরেই তৎক্ষণাৎ নগরীর বাইরে থাকা বিপুল পরিমাণ দ্রব্য ও সম্পত্তি আমার সৈন্যদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়। রাও দুল চাইন দুর্গ ও দেয়াল (নগরীর) সুরক্ষিত করে তাঁর প্রতিরক্ষা প্রস্তুত করেন এবং একই সময়ে আমি স্থানটিতে হামলা চালিয়ে জয় করে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি।

ভাটনির অবরোধ

ভাটনির দুর্গ দখল করে নেবার স্থিরসিদ্ধান্ত গ্রহণের পর আমি শেখ নুর-উদ্দিন, আমীর সুলায়মান, আমীর আল্লাহদাদ ও অন্যান্য আমীরদেরকে নিযুক্ত করে দুর্গের ডান দিক দিয়ে হামলা চালানোর নির্দেশ দেই, তাঁদেরকে দেয়ালগুলোর উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা চালাতে বলি। দুর্গের বাম দিক দিয়ে হামলা চালিয়ে সেটি দখল করার চেষ্টা চালাতে আমি শাহজাদা খলিল সুলতান, আইকু তৈমুরের পুত্র শেখ মোহাম্মদ এবং সৈন্যবাহিনীর অন্যান্য কিছু সেনাপতিকে নিয়োগ করি। আমি নিজে দুর্গের দ্বার বরাবর আমার সৈন্যবাহিনীর মাঝামাঝি অবস্থান নিয়ে এগুতে থাকি। আমার দুঃসাহসী সৈন্যরা সবদিক থেকে দুর্গ ও দেয়ালগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। একেবারে প্রথম হামলাতেই দুর্গের প্রতিরক্ষা ও দেয়ালগুলো হিন্দুদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ফেলা হয় এবং শহরটি দখলে চলে আসে। বহু রাজপুতকে তরবারীর আঘাতে খতম করে দেয়া হয় এবং নগরীর মধ্যে যত বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ ছিল সবই পরিত্যক্ত মত আমার সৈন্যদের হাতে পড়ে। দুর্গটি দখল করার এই যুদ্ধে আমার সাহসী লোকেরা খুবই উদ্যম ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করে। রাও দুল চাইন তাঁর লড়াকু রাজপুতদেরকে নিয়ে দুর্গের দ্বারে অবস্থান নেন, যাতে প্রবেশপথে প্রতিরোধ করতে পারেন। আমি তখন শাহজাদা শাহরুখ, আমীর সুলায়মান শাহ ও আমীর জাহান মালিকের সৈন্যদলের সেনাপতিদেরকে রাও দুল চাইন ও তাঁর চারপাশে সমবেত লোকদের উপর আপতিত হবার নির্দেশ দেই। তাঁরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে তাঁদের বলসে ওঠা তরবারীর দ্বারা যথেষ্ট সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন করেন। জাহান মালিক সিংহের মত লড়াই করেন এবং সৈয়দ খাজা বহু শত্রুকে কেটে খতম করে দেন। আমার সমস্ত কর্মকর্তা ও সাহসী সৈন্যরা পিঁপড়া ও পঙ্গপালের মত দুর্গের চারপাশে ঝাঁক বেঁধে জড়ো হয়। কেউ কেউ গড়খাইয়ের কিনারের দিকে এগিয়ে যায় এবং কেউ কেউ এটা পার হয়ে যায়। রাও দুল চাইন যখন বুঝতে পারলেন যে, আমার লোকদের বীরত্ব ও রণনৈপুণ্যের জোরে তাঁর দুর্গটি দখল হয়ে যাচ্ছে, তখন তিনি আত্মসমর্পণের জন্য শোর-চিৎকার শুরু করেন। তিনি আমার কাছে এসে বশ্যতা স্বীকারের স্থিরসিদ্ধান্তের

কথা ঘোষণা করে যুদ্ধবিরতির আবেদন জানান। তিনি তাঁর পক্ষ হয়ে মধ্যস্থতা করার জন্য একজন সাইয়্যিদকে পাঠান। সেই সাইয়্যিদ আমার কাছে এসে রাও দুল চাইনের হতভাগ্য ও শোচনীয় দশার কথা যখন তুলে ধরেন, তখন ধূসর শূশ্রুমণ্ডিত সেই মধ্যস্থতাকারীর প্রতি এবং সাধারণভাবে সাইয়্যিদদের প্রতি আমার যে শ্রদ্ধা রয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি আমার সৈন্যদেরকে যুদ্ধ বন্ধ করার নির্দেশ দিতে তাগিদ বোধ করি। তাদেরকে বলি যে, রাও পরদিন এসে আত্মসমর্পণ করতে স্থিরসিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমার নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে সৈন্যরা দুর্গ থেকে সরে গিয়ে শহরের বাইরে অবস্থান নেয়। খুবই সজাগ থেকে ও সতর্কতার মধ্যদিয়ে আমরা রাতটি পার করি। সকাল হলে রাও তাঁর কথা ভঙ্গ করেন। তিনি কথামত আমাকে শ্রদ্ধা জানাতে আসলেন না। আবারো প্রবল তেজের সাথে দুর্গটিকে আক্রমণ করার জন্য আমি আমার সৈন্যদেরকে নির্দেশ দেই। সবাইকে যার যার সামনের দেয়ালের নিচ দিয়ে খুঁড়ে ঢুকে পড়ার একটি পথ তৈরী করে ফেলার জন্য বলি। এই নির্দেশ কার্যকর করার জন্য সৈন্যরা দেয়ালের নিচে গর্ত করতে দ্রুতবেগে সামনে এগিয়ে যায় এবং ভয়ানক যুদ্ধ শুরু হয়। অবরুদ্ধরা আক্রমণকারীদের বৃষ্টির মত মাথার উপর তীর, পাথর ও আতশবাজি বর্ষণ করতে থাকে, তবে আমার সাহসী লোকেরা তাদের মাথা ও কাঁধের উপর ছুঁড়ে মারা এইসব ক্ষেপণাস্রকে ময়লা-আবর্জনা হিসাবে গণ্য করে তাদের কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। শত্রুরা দেখতে পায় যে, তারা সবদিক থেকে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে, ওদিকে দেয়ালের নিচে ফাটল তৈরী হয়ে গেছে, তখন তাদের মাঝে ভীতির সঞ্চার হয়, তারা হতাশ হয়ে পড়ে এবং তারা প্রতিরোধ করা ছেড়ে দেয়। রাও দুল চাইন ও তাঁর অনুসারীরা (সিপাহীরা) গুলি চালাবার ফোকরযুক্ত দেয়ালের উপর চলে আসেন এবং তাদের দুর্দশা ও কষ্টের কথা নানান আকার-ইঙ্গিতে বুঝানোর মাধ্যমে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। তাঁরা অঙ্গীকার করেন যে, আমি যদি অনুগ্রহ করে তাঁদের অপরাধ ক্ষমা করে দেই তাহলে তারা আত্মসমর্পণ করবেন এবং তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য বিশ্বস্ততার সাথে আমার সামনে হাজির হবেন। তাঁদের হতাশাজনক অবস্থা আমি ভালো করেই জানতাম, কিন্তু জ্ঞানী লোকদের একটি কথা আমার মনে পড়ে যায়, সেটি হল ‘বিজয়ের চেয়ে অনুকম্পা ভালো’। তাই আমি শত্রুদের আবেদন মঞ্জুর করি এবং আমার শিবিরে ফিরে আসি। সেইদিনই সন্ধ্যায় রাও দুল চাইন তাঁর পুত্র ও সহকারীকে আমার তাঁবুতে পাঠান, তাঁরা সাথে করে উপহার হিসাবে আনেন শিকারের কিছু সরঞ্জাম এবং কিছু আরব অশ্ব। আমি সেই যুবককে দয়া ও রাজপুরুষোচিত সম্মান সহকারে অভ্যর্থনা জানাই, তাঁকে সম্মানসূচক পোশাক ও সোনার খাপসহ একটি তরবারী দেই এবং তাঁর পিতার কাছে ফেরত পাঠাই। আমি তাঁকে নির্দেশ দেই যাতে তিনি তাঁর

পিতাকে চালাকি ও বিশ্বাসঘাতকতা করার যেকোন পরামর্শ না শুনার ব্যাপারে সতর্ক করে দেন, বরং যেন আমার কাছে আসেন এবং খোলাখুলিভাবে আত্মসমর্পণ করেন, আমি তখন তাঁকে আনুকূল্য দেখাবো। যদি তিনি কোনভাবে বিলম্ব করেন তাহলে কি ঘটবে তা তিনি অবশ্যই দেখতে পাবেন।

পুত্রটি তাঁর পিতার কাছে ফিরে গিয়ে তিনি যা দেখেছেন এবং শুনেছেন সবই তাঁকে বলেন। রাও দুল চাইনের কাছে আর কোন উপায়ই ছিল না, তাই শুক্রবার ২৮শে সফর সকাল বেলা তিনি তাঁর দুর্গের বাইরে এসে আমার তাঁবুর দিকে রওনা দেন। তিনি শেখ সা'দ আজোধানিকে সাথে নিয়ে আসেন। আমীররা তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার পর তাঁকে আমার পদ চুম্বনের সম্মান লাভের অনুমতি দেয়া হয়। তিনি আমাকে সোনায় বাঁধানো অশ্বের সাজসজ্জাসহ ২৭টি আরবীয় অশ্ব এবং বহু শিকারী বাজপাখি উপহার দেন। আমি তাঁকে স্বস্তি দেই এবং একটি সোনার বুটিদার রেশমি পোশাক, একটি টুপি, সোনার কারুকাজ করা একটি কোমরবন্ধ এবং সোনায় মোড়ানো একটি তরবারী প্রদান করি।

দেশটির একদল জমিদার ও প্রধান ব্যক্তি তাদের প্রশাসকদেরকে হত্যা করে, বিশেষকরে দিবাঁলপুরের লোকেরা— যারা মুসাফির কাবুলীকে এক হাজার লোকসহ হত্যা করেছিল। এইসব লোক পালিয়ে ভাটনিরে আশ্রয় নেয়। তাই আমি আমীর সুলায়মান ও আমীর আল্লাহদাদকে তাঁদের বাহিনীসহ শহরে গিয়ে সমস্ত বহিরাগতের মধ্যে যাকে যাকে খুঁজে পাওয়া যায় তাদেরকে তাদের সম্পত্তি ও মালপত্রসহ বের করে নিয়ে আসার নির্দেশ দেই। নির্দেশ বাস্তবায়নার্থে তাঁরা শহরটিতে যান এবং সমস্ত শরনার্থীকে বের করে তাদের সম্পত্তি ও মালপত্রসহ আমার তাঁবুতে নিয়ে আসেন। ২৯শে সফর আমি এইসব লোককে আমার আমীরদের মাঝে একেকজনকে অধিক সংখ্যায় বন্টন করে দেই এবং এইসব সাহসী লোকের অর্থকড়ি ও মূল্যবান জিনিসপত্র রাজকীয় ব্যবহারের জন্য বাজেয়াপ্ত করি। উক্ত লড়াইকালে আটককৃত ৩শত আরব অশ্ব আমি আমার সৈন্যদের মাঝে বিলিয়ে দেই। মুসাফির কাবুলী ও তাঁর এক হাজার অনুসারীর হত্যার প্রতিশোধস্বরূপ দিবাঁলপুরের ৫শত লোককে শাস্তি দিতে এবং তাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে ক্রীতদাসে পরিণত করতে আমি নির্দেশ দেই— যাতে এটা এই ধরনের অন্য সাহসী লোকদের জন্য সতর্কবাণী হয়ে থাকে। আজোধান ও অন্যান্য স্থানের লোকদেরকে আমি তাদের অপরাধ অনুসারে শাস্তি প্রদান করি। কেউ কেউ কঠোর শাস্তি পায় এবং তাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে ক্রীতদাসে পরিণত করা হয়, অন্যদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়।

আমি যখন অপরাধীদের উপর শাস্তি প্রয়োগ করছিলাম তখন রাও দুল চাইনের ভাই কামাল উদ্দিন^{১৪} এবং রাওয়ের পুত্র ভয়ে পীড়িত হয়ে পড়েন। দুল

চাইন আমার শিবিরে অবস্থান করা সত্ত্বেও তারা দুর্গে পাগিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেন। তাদের এই কাণ্ডের কথা শুনে আমি রাওকে বন্দী করে রাখার আদেশ দেই। আমার ক্রোধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে। আমি আমার সেনাপতি ও সৈন্যদেরকে দেয়াল ভেঙ্গে এবং দেয়াল বেয়ে উঠে দুর্গটিকে গুটিয়ে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করি। যখন দুর্গের সৈন্যরা বুঝতে পারলো যে, আমার লোকেরা দুর্গ আক্রমণ করার জন্য সাহসের সাথে অগ্রসর হচ্ছে, তখন রাওয়ের ভাই ও পুত্র আবারো ভয় ও অসহায়ত্বের কথা বলে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। তাঁরা তাঁদের গলার উপর তরবারী রেখে তাঁদের নির্বুদ্ধিতার ওজর দেখানোর জন্য আমার শিবিরে আসেন এবং আমার সেনাপতিদের হাতে দুর্গের চাবি তুলে দেন। আমি তাঁদের প্রাণকে রেহাই দেই।

১লা রবিউল আউয়াল আমীর শেখ নুরুদ্দিন ও আমীর আল্লাহদাদকে বন্দীদের মুক্তিপণের টাকা আদায় করে নগরীতে পাঠিয়ে দিতে আমি নির্দেশ প্রদান করি। নগরীটির রাই, রাজপুত ও প্রধানগণ মুক্তিপণের টাকা প্রদানের বেলায় সুষ্ঠু আচরণ করেননি, যদিও এটা এমন একটা বিষয়, যে ব্যাপারে একটি সম্মানজনক লেন-দেন হওয়া প্রয়োজন ছিল। আদায়কারী ও দুষ্ট-মনা রাইদের মধ্যে বিবাদ ও লড়াই বেঁধে যায়। এই খবর যখন আমার কানে আসে, এইসব কাফেরকে শাস্তি দেবার জন্য আমি আমার সাহসী লোকদেরকে নির্দেশ দেই। এই নির্দেশের প্রতি আনুগত্য সরূপ সৈন্যরা দুর্গের দিকে ধাবিত হয়ে দুর্গের দেয়ালের গায়ে মই বসায় ও দড়ি ঝুলিয়ে দেয় এবং সেইভাবে দেয়ালে উঠে দুর্গটি দখল করে নেয়। তখন দুর্গের মধ্যে কাফের ও মুসলমান উভয়েই মরিয়া হয়ে লড়াইতে থাকে। কাফেররা তাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে নিয়ে তাদের বাড়ী-ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করে আগুন ধরিয়ে দিয়ে সবাই সপরিবারে আত্মহত্যা দেয়। যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলতো, অথচ মুসলমানদের দল থেকে বিচ্যুত ছিল, তারা তাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে তরবারীর দ্বারা হত্যা করে এবং এরপর সাহসের সাথে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য একত্রে যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটে আসে। আমার লোকেরা সবদিক থেকে দুর্গে প্রবেশ করে এবং তাদের তরবারী ও চাকু নিয়ে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। দুর্গের লোকেরা ছিল বয়সে তরুণ, বলবান, লড়াকু ও সাহসী। তারা দৃঢ়তার সাথে লড়াই করে। ফলে মরণপণ লড়াই চলতে থাকে। আমার কিছু নামকরা ও সাহসী লোক অসাধারণ সাহসের প্রতিভা প্রদর্শন করে। তবে সাংঘাতিক ভীতিপ্রদ আঘাতপ্রাপ্ত হয়। আমীররা তাঁদের তরবারীর সাহায্যে তাঁদের দৃঢ়তা বজায় রাখেন এবং পুরুষোচিত সাহসের সাথে লড়াই ও জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। আমীর শেখ নুরুদ্দিন পায়ের উপর দাঁড়িয়ে কাফেরদের সাথে ভয়ানক লড়াই চালিয়ে যান। অনেকেই তাঁর তরবারীর আঘাতের কবলে পড়ে। তাদের (শত্রুদের) অনেকেই

তখন একত্রিত হয়ে তাঁর উপর একসাথে হামলা চালায়। সেই আমীর তখন একা এবং শত্রু ছিল অনেক। অতঃপর সেইসব নিষ্ঠুরপ্রকৃতির লোক তাঁকে ধরে ফেলে বন্দী হিসাবে নিয়ে যাবার চেষ্টা চালায়। ঠিক এই সংকটপূর্ণ মুহূর্তে ফিরোজ সিন্তানী ও আউজান মজিদ বাগদাদী নুরুদ্দিনের পাশে উপস্থিত হয়ে কাফেরদের উপর উপর্যুপরি হামলা চালিয়ে তাদেরকে পিছু হটতে বাধ্য করেন। এইভাবে তাঁরা গেবরদের (হিন্দু বা বিধর্মীদের) হাত থেকে তাঁদের সাথীকে উদ্ধার করেন। অতঃপর ইসলামের সাহসী যোদ্ধারা কাফেরদের উপরে চারিদিক থেকে সিংহের মত বিক্রমে হামলা চালায় ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ না আল্লাহর রহমতে আমার সৈন্যদের প্রচেষ্টার উপর সাফল্যের আলোকরশ্মি ঔজ্জ্বল্য ছড়ায়। অল্প সময়ের মধ্যে দুর্গের সমস্ত লোক তরবারীর খোরাকে পরিণত হয় এবং এক ঘণ্টার মধ্যে দশহাজার কাফেরের মাথা কেটে ফেলা হয়। কাফেরদের রক্তে ইসলামের তরবারী ধৌত হয়ে যায়^৭ এবং দুর্গে এক বছর ধরে জমা করে রাখা সমস্ত মাল-পত্র, কোষাগার ও শস্য আমার সৈন্যদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পরিণত হয়। আমার সৈন্যরা ঘর-বাড়ীগুলোতে আগুন লাগিয়ে ভস্মে পরিণত করে এবং দালান-কোঠাগুলো ও দুর্গটি মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়। বিজয় সম্পন্ন হলে আমি আমার তাঁবুতে ফিরে যাই। এই বিজয় এবং যে যুদ্ধলব্ধ বিশাল পরিমাণ মালপত্র আমার হস্তগত হয়েছিল তার জন্য আমাকে অভিনন্দন জানাতে সব শাহজাদা ও আমীরগণ সেখানে অপেক্ষমান ছিলেন। সমস্ত মালপত্র বাইরে নিয়ে এসে সবই আমার সাহসী আমীর ও সৈন্যগণের মাঝে বন্টন করে দেই। নুরুদ্দিনকে রক্ষা করায় আমি মজিদ বাগদাদী ও ফিরোজ সিন্তানীকে বড় ধরনের উপহার দেই এবং উচ্চপদে উন্নীত করি।

এই অঞ্চলের রাই ও রাজাগণকে এবং হাজামাকারী বাসিন্দাদেরকে উচ্ছেদ করে আমার অন্তর শান্ত হলে ওরা রবিউল আউয়াল বিদায়ের বাদ্য বেজে ওঠে, আমি আমার অশ্বে আরোহণ করি এবং চৌদ্দ ক্রোশ পথ চলার পর একটি জলাশয়ের সীমান্তে তাঁবু ফেলি। কাছেই ঘাঁসে পূর্ণ একটি জঙ্গল ছিল। পরদিন আমি আবার পথচলা শুরু করি এবং ফিরোজ দুর্গ অতিক্রম করে সরস্বতি নামের একটি শহরে পৌঁছি।

সরস্বতি শহর বিজয়

সরস্বতি শহর সম্পর্কে আমি যখন খোঁজ-খবর করি তখন আমাকে জানানো হয় যে, এই স্থানের লোকেরা ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে অপরিচিত এবং তারা বাড়ীতে শূকর রাখে, ঐসব প্রাণীর মাংশ খায়। আমার আগমনের কথা শুনে তারা নগরী ছেড়ে চলে যায়। তাদেরকে ধাওয়া করার জন্য আমি আমার অশ্বারোহী বাহিনী প্রেরণ করি এবং একটি বড় ধরনের লড়াই বেঁধে যায়। এই সমস্ত হিন্দু কাফেরকে হত্যা করে তাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে বন্দী করা হয় এবং তাদের সম্পত্তি ও মালামাল পরিত্যক্ত হিসাবে বিজয়ীদের হাতে এসে পড়ে। বহু হাজার হিন্দু নারী ও ছেলেমেয়ে সাথে নিয়ে সৈন্যরা ফিরে আসে, ঐসব নারী ও ছেলেমেয়ে মুসলমান হয়ে যায় এবং কালেমা পাঠ করে। এই কাজে যেসব সাহসী লোক অংশ নিয়েছিল তাঁদের মধ্যে কেবল আদিল বাহাদুর ফাররাশের পতন ঘটে।

পরদিন আমি সরস্বতি শহরে বিশ্রাম গ্রহণ করি এবং এর পরদিন মাসের ৬ তারিখ আমি আঠারো ক্রোশ পথ চলার পর ফতেহাবাদ দুর্গের কাছে পৌঁছে শিবির স্থাপন করি। শয়তানের পরামর্শে ফতেহাবাদের লোকজনও শহর থেকে পালিয়ে মরুভূমি ও জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নেয়। আমি সৈন্যবাহিনীর কিছু অধিনায়ককে তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করি। তাদের বহু সংখ্যককে তারা হত্যা করে। তারা তাদের সমস্ত সম্পত্তি ও মালামাল, অশ্ব ও গবাদিপশু আটক করে এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তির বোঝা নিয়ে শিবিরে ফিরে আসে। পরদিন আমি ফতেহাবাদ থেকে পথচলা শুরু করি এবং রজবপুর দুর্গ অতিক্রম করে আহরুনি দুর্গের কাছাকাছি এলাকায় থামি। শহর ও দুর্গের লোকেরা ইসলামের সৈন্যবাহিনীর কঠোরতা থেকে বাঁচতে আমার সাথে সাক্ষাত এবং বশ্যতা স্বীকার করতে এলো না। অতঃপর কিছু ভয়ানক তুর্কী শহরটিতে প্রবেশ করে লুণ্ঠন শুরু করে দেয়। বাধা দিতে আসা কিছু বাসিন্দাকে তারা হত্যা করে, অন্যদেরকে বন্দী করা হয়। সৈন্যরা প্রচুর পরিমাণ খাদ্যশস্য নিয়ে আসে এবং শহরের বাড়ী ও দালান-কোঠায় আগুন লাগিয়ে দেয়।

মাসের ৮ তারিখ আমি জঙ্গলের মধ্যদিয়ে আহরুনি থেকে তোহানা নামের একটি গ্রামের দিকে যাত্রা করি। এখানকার বাসিন্দাদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর

নেওয়ায় জবাবে যা জানানো হয় তা হল, তারা এক বলবান জাতি এবং তাদেরকে 'জাট' বলা হয়। তারা শুধু নামেই মুসলমান এবং চুরি-চামারি ও মহাসড়কে ডাকাতিতে তাদের সমকক্ষ আর কেউ নেই। সড়কের উপর তারা মরুযাত্রীদের বহর লুটপাট করে। তারা মুসলমান ও ভ্রমণকারীদের কাছে এক আতংক হয়ে বিরাজমান। তারা এখন গ্রামটি পরিত্যাগ করে ইক্ষু ক্ষেত্র, উপত্যকা এবং জঙ্গলে পলায়ন করেছে। এই তথ্য আমার কানে এলে আমি একটি সৈন্যবাহিনী তৈরী করে তা হিন্দু কারকাররার পুত্র তোকাল বাহাদুরের অধীনে নিযুক্ত করে জাটদের বিরুদ্ধে পাঠিয়ে দেই। তারা যথারীতি ইক্ষু ক্ষেত্র ও জঙ্গলের মধ্যে যায়। আমি মাওলানা নাসিরুদ্দিনকেও তাদেরকে ধাওয়া করার জন্য প্রেরণ করি। এইসব বাহিনী জাটদেরকে ধরে ফেলার পর দুইশত জনকে তরবারী দিয়ে খতম করে দেয় এবং বাকীদেরকে বন্দী করে। গবাদিপশুর এক বিশাল মজুদ আটক হয় এবং সব নিয়ে আমার সৈন্যরা শিবিরে ফিরে আসে।

আবারো আমাকে মনে করিয়ে দেয়া হয় যে, এইসব দাঙ্গাবাজ জাটদের সংখ্যা পিঁপড়া বা পঙ্গপালের মত বিস্তার এবং কোন ভ্রমণকারী বা বণিক তাদের হাত থেকে অক্ষতভাবে পথ অতিক্রম করতে পারেনা। তারা এখন পালিয়ে জঙ্গল ও মরুভূমিগুলোতে চলে গেছে— যেখানে আমার সৈন্যদের প্রবেশ করা কষ্টকর। তাদের মধ্যেকার গুটি কতককেই কেবল হত্যা করা হয়েছে, তবে এটা আমার দৃঢ়প্রত্যয় যে, আমি যেসব দেশ জয় করবো সে দেশগুলোকে চোর ও ডাকাত মুক্ত করে যাব, যাতে আল্লাহর বান্দারা এবং মুসলমান ও ভ্রমণকারীরা তাদের সহিংসতা থেকে নিরাপদ হয়। হিন্দুস্তান আক্রমণ করার পেছনে আমার একটি বড় উদ্দেশ্য হচ্ছে কাফের হিন্দুদের বিরুদ্ধে একটি ধর্মযুদ্ধ (জিহাদ) চালানো এবং এই জাটদেরকে খতম করে ভ্রমণকারীদেরকে এদের হাত থেকে মুক্তি দিয়ে যাওয়া খুবই দরকার বলে এখন আমার কাছে প্রতীয়মান হল। অতঃপর আমি মালপত্র ও বিভিন্ন বিজয় অভিযানগুলোতে প্রাপ্ত লুটেরমালগুলো আমীর সুলায়মান শাহ'র হেফাজতে দেই যাতে তিনি ভারী মালপত্রের সাথে এইসব নিয়ে সামান্য শহরে চলে যান।

মাসের ৯ তারিখ আমি তোহানা থেকে মালপত্র পাঠিয়ে দেই। একই দিন বন-জঙ্গলের ভিতর গিয়ে দুই হাজার শয়তানের মত জাটকে হত্যা করি। আমি তাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে বন্দী এবং তাদের গবাদিপশু ও সম্পত্তি লুণ্ঠন করি। এইভাবে আমি এইসব লুণ্ঠনকারী জাটদের হাতে দীর্ঘদিন ধরে দুর্ভোগের শিকার এই দেশটাকে তাদের হাত থেকে মুক্ত করি। একই দিন কাছাকাছি বসবাসরত সাইয়্যিদ (সৈয়দ)দের একটি দল সৌজন্য ও নম্রতা সহকারে আমার সাথে দেখা করতে আসেন এবং খুবই অনুগ্রহের সাথে তাঁদেরকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। নবী

(সাঃ)এর বংশধরদের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধার কারণে আমি তাঁদের প্রধানদেরকে ব্যাপক সম্মান দেখাই। আমি তাঁদেরকে মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ প্রদান করি এবং আমার কোন সৈন্য যাতে তাঁদেরকে কোনভাবে ক্ষতি করতে না পারে সে ব্যাপারে তাঁদেরকে রক্ষার্থে তাঁদের আবাসস্থলে যাবার জন্য একজন কর্মকর্তাকে নিযুক্ত করি।

আমি এই স্থান থেকে খাগর নদীর তীরের দিকে রওনা হই, সেখানে আমি থামি এবং মাসের ১১ তারিখ মালপত্র নিয়ে আমীর সুলায়মান শাহও সেখানে এসে উপস্থিত হন। সামানা নামক স্থানটি এখান থেকে কাছেই হওয়ায় এবং ভারী মালপত্র তখনও এসে না পৌছায় আমি বেশকিছু দিন সেখানে থামি। ১৩ তারিখ আমি পুনরায় পথচলা শুরু করি এবং খাগর নদীর উপর কোটিলা সেতু নামক একটি প্রাচীন অবকাঠামোর কাছাকাছি থামি। এই পর্যায়ে সুলতান মাহমুদ খান, শাহজাদা রুস্তম এবং সৈন্যবাহিনীর বাম অংশের অন্য অধিনায়কগণ— যাদেরকে আমি কাবুলের পথ ধরে হিন্দুস্তান যেতে আদেশ দিয়েছিলাম— তারা এসে আমার সাথে পুনঃমিলিত হন। আমি তাঁদেরকে অনুগ্রহের সাথে অভ্যর্থনা জানাই এবং তাঁদের পথচলাকালীন যেসব ঘটনা ঘটেছে সেসব সম্পর্কে খোজ-খবর করি। তাঁরা আমাকে জানান যে, কোন নগরী বা গ্রাম বা দুর্গ যা-ই হোক, যেখানেই লোকেরা বশ্যতা স্বীকার করেছে ও রাজস্ব প্রদান করতে সম্মতি জানিয়েছে, তাদেরকে আশ্রয় (রেহাই) দেয়া হয়েছে, তবে যখনই কোন নগরী বা দুর্গের লোকেরা প্রতিরোধ করতে চেয়েছে তখন তা জয় করা হয়েছে, তার বাসিন্দাদেরকে হত্যা করা হয়েছে, তাদের মালপত্র ও সম্পত্তি লুণ্ঠন করা হয়েছে এবং সেসব পরিত্যক্ত সম্পদ সৈন্যদের মাঝে বন্টন করে দেয়া হয়েছে। আমি তাঁদের এইসব কাজ অনুমোদন করি এবং প্রশংসা জানাই।

পরদিন আমি সেতু পাড়ি দিয়ে থামি। আমীর শাহ মালিক ভারী মালপত্রসহ নিরাপদে দিবালাপুরের পথ ধরে নিয়ে এসে এখানে আমার সাথে যোগ দেন। পরদিনও আমি এইস্থানে অবস্থান করি, তবে ১৮ তারিখ আমি কোটিলা সেতু ও খাগর নদী থেকে রওনা হই এবং পাঁচ ক্রোশ পথ চলার পর শিবির স্থাপন করি। পরদিন সামানা থেকে ১৭ ক্রোশ দূরবর্তী কাইখাল শহরে পৌছি। এখন আমি হিন্দুস্তানের রাজধানী দিল্লীর কাছাকাছি এসে পড়েছি এবং বিজয় লাভের প্রস্তুতি শুরু করি।

দিল্লী জয়ের প্রস্তুতি

দিল্লীর উপর আক্রমণ চালানোর উদ্দেশ্যে আমি আমার বাহিনীকে নিম্নোক্তরূপে বিন্যস্ত করি : ডান পার্শ্বের অংশকে আমি শাহজাদা পীর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর, শাহজাদা রুমুম, আমীর সুলায়মান শাহ এবং... (অন্যান্য)এর নেতৃত্বাধীনে অর্পণ করি, বাম পার্শ্বের অংশ সুলতান মাহমুদ খান, শাহজাদা খলিল সুলতান, শাহজাদা সুলতান হোসেন, আমীর জাহান শাহ এবং... (অন্যান্য)এর উপর অর্পণ করি। বিখ্যাত তুমান ও আমীর আল্লাহদাদের সানসেরের (?) তুমানদেরকে এবং... সৈন্যবাহিনী আমি আমার নিজের নির্দেশাধীনে রাখি। তাদেরকে আমি কুড়ি ক্রোশ এলাকাব্যাপী ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বিন্যস্ত করি। সৈন্যবাহিনী বিন্যস্ত করার ব্যাপারে সম্ভ্রষ্ট হয়ে আমি দিল্লীর পথে যাত্রা শুরু করি। ২২শে রবিউল আউয়াল আমি আসপানদি গ্রামের দুর্গে এসে পৌঁছি এবং সেখানে তাঁবু ফেলি। এই স্থান সম্পর্কে খোঁজ-খবর করায় যে জবাব পেলাম তাতে আমি দেখলাম যে, সামানা এখান থেকে সাত ক্রোশ দূরে। সামানা, কাইখাল ও আসপানদির জনগণ কাফের (বিধর্মী), মুশরিক (মূর্তি পূজক), বে-দ্বীন (ইসলাম ধর্মে অবিশ্বাসী) এবং ভ্রান্ত ধর্মে বিশ্বাসী। তারা তাদের বাড়ী-ঘরে আগুন দিয়ে সন্তান-সন্ততি, সম্পদ ও মালপত্র নিয়ে দিল্লীর দিকে পালিয়ে যাওয়ায় এই পুরো দেশটা জনশূন্য হয়ে পড়েছে। পরদিন, মাসের ২৩ তারিখ আমি আসপানদি দুর্গ থেকে রওনা হয়ে ছয় ক্রোশ পথ অতিক্রম করে তুঘলকপুর গ্রামে এসে পৌঁছি। সেই একই নামের একটি দুর্গের বিপরীতে আমি শিবির স্থাপন করি। আমার সৈন্যবাহিনীর আগমনের কথা শুনে এই দুর্গের লোকেরা এটা ছেড়ে চলে গেছে এবং দেশটির বিভিন্নস্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছে। আমাকে দেয়া তথ্য থেকে আমি জানলাম যে, এইসব লোকদেরকে সানাবি (অগ্নি উপাসক) বলা হয়। এই বিপথগামী ধর্মমতের অনেকেই বিশ্বাস করে যে, সৃষ্টিকর্তা দুই জন। একজনের নাম ইয়াজদান এবং যা কিছু ভালো তা এই সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকেই আসে বলে তারা বিশ্বাস করে। অন্য সৃষ্টিকর্তাকে তারা আহরিমান নামে ডাকে এবং যেসব পাপ ও দুষ্টামির জন্য তারা অপরাধী হয়, সেসবই এই আহরিমানের কাজ বলে তারা মনে করে। এইসব ভ্রান্তবিশ্বাসীরা জানেনা যে, ভালো বা

মন্দ যা-ই হোক সবই আসে আগ্রাহর কাছ থেকে এবং মানুষ সেসব ভালো-মন্দ সংঘটনের মাধ্যম মাত্র। আমি এইসব কাফেরের বাড়ী-ঘর পুড়িয়ে ফেলার এবং তাদের দুর্গ ও দালান-কোঠা ধুলিস্মাৎ করে দেবার আদেশ দেই।

পরদিন, মাসের ২৪ তারিখ আমি পানিপথের দিকে রওনা দেই, সেখানে তাঁবু ফেলি। সেখানে আমি দেখলাম, দিল্লীর শাসকের কাছ থেকে আদেশ পেয়ে লোকেরা তাদের সমস্ত বাড়ী-ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেছে। সৈন্যরা দুর্গে ঢুকার পর আমার কাছে খবর পাঠায় যে, তারা গমের এক বিশাল মজুদ পেয়েছে, যা ওজনে কয়েক হাজার মন হবে। আমি এসবের সঠিক পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য ওজন দেয়ার এবং এরপর সবই সৈন্যদের মাঝে বিতরণ করে দেয়ার নির্দেশ দেই। ওজন দিয়ে দেখা গেল, তার পরিমাণ বড় ওজনে (সাজ-ই কালান) দশ হাজার মন, অথবা আইনগত মান (সাজ-ই সারা) অনুযায়ী ১লাখ ৬০হাজার মন। পরদিন আমি পানিপথ থেকে ছয় ক্রোশ পথ চলি এবং এক নদীর তীরে তাঁবু ফেলি, যেটি ছিল রাস্তার উপরে। আমি সেখান থেকে শুক্রবার, মাসের ২৬ তারিখ রওনা দেই এবং আমার কর্মকর্তা ও সৈন্যদেরকে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে প্রত্যেককে তার যথাযথ বাহিনীতে অবস্থান নিয়ে সঠিকভাবে প্রস্তুত থাকতে বলি। আমরা কাহি-গাজিন নামের একটি গ্রামে পৌঁছি এবং সেখানে তাঁবু ফেলি। আমি একটি আদেশ জারি করি যে, ঠিক পরদিন, মাসের ২৮ তারিখ হিন্দুস্তানের অন্যতম বৃহৎ নদী যমুনার তীরবর্তী একটি পাহাড়ের উপরে সুলতান ফিরোজ শাহ কর্তৃক নির্মিত ‘জাহান-নুমা’ প্রাসাদের বিরুদ্ধে একদল অশ্বারোহী বাহিনী অবশ্যই একটি লুণ্ঠন প্রমোদভ্রমণে যেন এগিয়ে যায়। সৈন্যদেরকে আদেশ দেয়া হয়, সেখানে তারা যা পাবে, যাকে পাবে লুণ্ঠ করবে, ধ্বংস করবে এবং প্রত্যেককে হত্যা করবে। পরদিন আমার আদেশের প্রতি আনুগত্যসরূপ সৈন্যদল যাত্রা করে এবং জাহান-নুমা প্রাসাদের দিকে এগুতে থাকে, প্রাসাদটি দিল্লী থেকে পাঁচ মাইল দূরে। তারা যেসব গ্রামে ও স্থানে গিয়েছে, সবই লুণ্ঠ করেছে, প্রত্যেক লোককে হত্যা করেছে এবং তাদের সমস্ত মূল্যবান জিনিসপত্র ও গবাদিপশু কেড়ে নিয়ে প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহ করেছে।^{১৬} এরপর তারা বহুসংখ্যক হিন্দু নারী-পুরুষ বন্দীকে নিয়ে ফিরে আসে।

মাসের ২৯ তারিখ আমি আবার রওনা দেই এবং যমুনা নদীর তীরে পৌঁছি। আমি নদীর অপর পাড়ে একটি দুর্গ দেখতে পাই, সেটি সম্পর্কে খোঁজ-খবর করায় আমাকে জানানো হয় যে, এটি একটি শহর ও একটি দুর্গ নিয়ে গঠিত,^{১৭} এর নাম ‘লোনি’ এবং এখানে সুলতান মাহমুদের পক্ষ হতে মাইয়ুন নামের এক ব্যক্তি কোতোয়াল হিসাবে অবস্থান করছে। আমি তক্ষুণি দুর্গটি দখল করে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি, আমি যেখানে অবস্থান করছিলাম সেখানে পশুদের

চারপাশেই ছিল কম, তাই আমি সেদিনই যমুনা নদী পাড়ি দেই। আমি আমীর জাহান শাহ, আমীর শাহ মালিক ও আমীর আল্লাহদাদকে দুর্গটি অবরোধ করার জন্য পাঠাই এবং দুর্গের বিপরীত দিকে আমার শিবির স্থাপন করি। তাঁরা মাইমুন নামের কোতোয়ালের নেতৃত্বাধীন সেই দুর্গে হামলা চালায়। মাইমুন প্রতিরোধের প্রস্তুতি নেয়। এই সময় শহরে বসবাসকারী একজন ধার্মিক শেখ খুবই বুদ্ধিমত্তার সাথে শহর থেকে বেরিয়ে আমার সাথে দেখা করতে আসেন। যদিও শেখদেরকে লোকেরা খুবই সম্মান দেখাতো, তথাপি এই সময় তারা তাঁর পরামর্শে কর্ণপাত না করে, বরং আমার কাছে আত্মসমর্পণ করার চেয়ে যুদ্ধ করতেই মনঃস্থির করেছিল। এইসব লোকেরা ছিল হিন্দু এবং তারা মাগু খানের দলভুক্ত ছিল। তারা তাদের শ্রদ্ধাস্পদ ধর্মীয় নেতার পরামর্শ অবজ্ঞা করে প্রতিরোধ গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়। আমি তা জানতে পেরে আমার সমস্ত আমীর ও সৈন্যদেরকে সমবেত হতে এবং দুর্গে হামলা চালাতে নির্দেশ দেই। সেই অনুসারে তারা উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে দুর্গের চারপাশে সমবেত হয় এবং দিনের এক প্রহরের মধ্যেই সেস্থানটি দখল করে নেয়। দুই নদীর মাঝখানে একটি দোয়াবে দুর্গটি অবস্থিত ছিল— একটি নদীর নাম যমুনা এবং অপরটির নাম হালিন— হালিন একটি বড় খাল, যা সুলতান ফিরোজশাহ কর্তৃক কালিনী নদী থেকে কেটে ফিরোজাবাদ পর্যন্ত আনা হয়েছিল এবং সেখানে এটি যমুনার সাথে সংযুক্ত হয়। অনেক রাজপুত তাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে তাদের বাড়ীর ভেতর আবদ্ধ করে পুড়িয়ে দিয়ে যুদ্ধে ছুটে এসেছিল এবং নিহত হয়েছিল। সৈন্যদলের অন্যরা যুদ্ধ করে নিহত হয় এবং বহুসংখ্যক লোককে বন্দী করা হয়। পরদিন আমি মুসলমান বন্দীদেরকে পৃথক করে নিয়ে রেহাই দেবার নির্দেশ দেই, তবে কাফেরদেরকে লোকান্তরের তরবারী দ্বারা জাহান্নামে পাঠিয়ে দিতে বলি। সাইয়্যিদ, শেখ ও আলেম (শিক্ষিত বা জ্ঞানী)দের ঘর-বাড়ী রক্ষা করার জন্যও আমি নির্দেশ দেই, তবে অন্যসব বাড়ী লুণ্ঠন এবং দুর্গটি ধ্বংস করে ফেলার জন্য বলি। আমার নির্দেশ মতই কাজ হয়েছিল এবং প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হাতে আসে।

লোনি বিজয়ের দ্বারা আমার মন তুষ্ট হবার পর আমি যমুনার ক্ষীণধারা^{১৮} খুঁজে বের করার জন্য সেখান থেকে ১লা রবিউল আখির অশ্বারোহণ করি এবং নদীর পাড় ধরে অগ্রসর হতে থাকি। জাহান নুমা প্রাসাদের বিপরীত দিকে এসে আমি কিছু স্থান দেখতে পাই যেখান দিয়ে নদী সহজে পার হওয়া যায়। যোহরের সময়ে (দুপুরে) আমি তাঁবুতে ফিরে আসি। আমি শাহজাদা ও আমীরদেরকে আসার জন্য নির্দেশ দেই। তারা এলে আমি দিল্লী আক্রমণ করার ও সুলতান মাহমুদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর বিষয় নিয়ে একটি পরিষদ সভা করি।

দিল্লী আক্রমণ করার বিষয়ে যুদ্ধ পরিষদ

যুদ্ধ পরিষদ- যেখানে সবার কিছু না কিছু বলার এবং মতামত জানানোর থাকে- সেখানে ব্যাপক আলোচনার পর প্রতীয়মান হল যে, আমার সৈন্যরা হিন্দুস্তানের হাতির শক্তিমস্তা, রণনৈপুণ্য ও আকার-আকৃতি সম্পর্কে গাল-গল্প শুনেছে। তারা বলছিল যে, যুদ্ধকালে সেই হাতি তার ঠুঁড় দিয়ে একজন অশ্বারোহীকে তার অশ্বসহ তুলে নিয়ে শূন্যে ছুঁড়ে মারে। কিছু সাহসী অশ্বারোহী সৈন্য এইসব গাল-গল্পের উপযুক্ত জবাব দিয়ে দেয়। অতঃপর যুদ্ধ পরিষদ একমত হয় যে, সৈন্যবাহিনীর রসদ হিসাবে প্রচুর পরিমাণ শস্য অবশ্যই লোনি দুর্গে সংগ্রহ ও মজুদ করতে হবে। এই কাজটা হয়ে গেলেই আমরা দিল্লী দুর্গ ও নগরী আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর হতে পারি। পরিষদ সভা শেষ হলে আমি আমীর জাহান শাহ, আমীর সুলায়মান শাহ ও অন্যান্য আমীরদেরকে নির্দেশ দিলাম তারা যেন যমুনা পাড়ি দিয়ে দিল্লীর শহরতলীতে ঢুকে পড়ে বলপূর্বক যত পারে শস্য হরণ করে সৈন্যবাহিনীর ব্যবহারের জন্য নিয়ে আসে।

এই সময় আমার মনে হল, জাহান-নুমা প্রাসাদ নিরীক্ষণ ও যে ময়দানে যুদ্ধ সংঘটিত হতে পারে সেই ময়দান পর্যবেক্ষণের জন্য অশ্বারোহী বাহিনীর একটি ছোট দল নিয়ে আমার যমুনা পাড়ি দেয়া উচিত। তাই আমি অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত ৭শত জনের একটি অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। আমি আলী সুলতান তাওয়াচি ও জুনাইদ বুরুলদাইকে অগ্রবর্তী প্রহরী হিসাবে প্রেরণ করি। যমুনা পাড়ি দিয়ে আমি জাহান-নুমায় পৌঁছি এবং পুরো দালানটি পরিদর্শন করি। আমি যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য একটি উপযুক্ত উন্মুক্ত প্রান্তর খুঁজে পাই। আমার অগ্রবর্তী প্রহরী আলী সুলতান ও জুনাইদ শত্রুর অগ্রবর্তী দলের অন্তর্ভুক্ত এক লোককে ধরে নিয়ে আসেন। আলী সুলতানের সেই বন্দীর নাম মোহাম্মদ সালাফ। আমি যখন সুলতান মাহমুদ ও মালু খান সম্পর্কে সেই লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলাম তখন আমি শুভ পূর্বাভাস হিসাবে তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেই। খবর সংগ্রহের জন্য প্রেরিত ব্যক্তি আমার কাছে খবর নিয়ে আসে যে, মালু খান ৪হাজার সশস্ত্র অশ্বারোহী, ৫হাজার পদাতিক ও ২৭টি ভয়ানক যুদ্ধহাতিসহ পুরোপুরি যুদ্ধসাজে

সজ্জিত হয়ে নগরীর বাগানগুলো থেকে বেরিয়ে এসেছেন এবং সৈন্যের ব্যূহ রচনা করেছেন। আমি সাইয়্যিদ খাজা ও মুবাশশার বাহাদুরকে ৩শত সাহসী তুর্কী অশ্বারোহীকে ধূসরবর্ণের অশ্বের উপর জাহান-নুমায় রেখে আমার শিবিরের দিকে প্রস্থান করি। মালু খান সাহসিকতার সাথে জাহান-নুমায় দিকে এগিয়ে আসেন এবং সাইয়্যিদ খাজা ও মুবাশশার তার মোকাবেলা করার জন্য সামনে এগিয়ে যান। একটি লড়াই বেঁধে যায় এবং আমার লোকেরা সাহসিকতার সাথে লড়াই করে। এই লড়াইয়ের কথা শোনার সাথে সাথে আমি সুনজাক বাহাদুর ও আমীর আল্লাহদাদকে দুইটি সেনাদলসহ তাদের মদদের জন্য পাঠিয়ে দেই। শত্রুরা নাগালের মধ্যে আসার সাথে সাথে তারা তীর বর্ষণ করে তাদেরকে হতবুদ্ধি করে দেয় এবং এরপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দফা হামলা চালানোর পর শত্রুরা পরাজিত হয় এবং বিশৃঙ্খলার মধ্যদিয়ে দিল্লীর দিকে পালিয়ে যায়। অনেকেই আমার লোকদের তরবারী ও তীরের শিকারে পরিণত হয়। ঐসব লোকেরা পালিয়ে যাবার সময় একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। বাঙ্গালী নামে পরিচিত একটি বিশাল যুদ্ধহাতি নিচে পড়ে গিয়ে মারা যায়। এটা শুনে আমি এটাকে শুভলক্ষণ বলে ঘোষণা করি। আমার বিজয়ী সৈন্যরা শত্রুদেরকে নগরীর প্রান্তদেশ পর্যন্ত ধাওয়া করে এবং এরপর আমার তাঁবুতে হাজির হবার জন্য ফিরে আসে। তাদের এই বিজয়কে আমি অভিনন্দন জানাই এবং তাদের কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করি। পরদিন শুক্রবার, মাসের ৩ তারিখ আমি লোনি দুর্গ ত্যাগ করে জাহান-নুমায় বিপরীত দিকে একটি অবস্থানে পৌঁছে তাঁবু স্থাপন করি। যেসব কর্মকর্তাদেরকে বলপূর্বক হরণ (লুটন) করার জন্য পাঠানো হয়েছিল তাঁরা প্রচুর পরিমাণ শস্য ও পরিত্যক্ত সম্পদ নিয়ে ফিরে আসেন।

যুদ্ধের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে রাজপুত্র ও আমীরদেরকে নির্দেশনা দেন তৈমুর

এই সময় আমি একটি সভা (দরবার) বসাই। রাজপুত্রগণ, আমীরগণ, নুইয়ানগণ, কুস্তনদের অধিনায়কগণ, হাজারী ও শতকী তুমানদের অধিনায়কগণ এবং সাহসী অগ্রগামী রক্ষীগণকে আমি ডেকে পাঠাই। তাঁরা সবাই আমার তাঁবুতে আসেন। আমার সব সৈন্যই সাহসী, অভিজ্ঞ এবং তারা আমার চোখের সামনেই তারা তরবারী ব্যবহার করেছে সাহসিকতার সাথে। তবে আমি যত লড়াই ও যুদ্ধ দেখেছি তত দেখেছে এমন কেউ নেই এবং আমি যত যুদ্ধ করেছি ও যত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তার সাথে তুলনা করার মত আমার আমীর বা সাহসী সৈনিকদের মধ্যে কেউই নেই। তাই আমি তাদেরকে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার, আক্রমণ হানার ও মোকাবেলা করার, তাদের লোকদেরকে (সৈন্যদের) বিন্যস্ত করার, একে অপরকে সহযোগিতা করার এবং শত্রুর সাথে যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে পূর্ব থেকে যত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়া দরকার তা গ্রহণ করার প্রণালী সম্পর্কে নির্দেশনা দেই। আমি ডান পার্শ্বের, বাম পার্শ্বের, সম্মুখভাগের ও পশ্চাতের আমীরদেরকে যথাযথভাবে তাঁদের অবস্থান গ্রহণ করার নির্দেশ দান করি। তাঁরা যেন খুব বেশী এগিয়ে না যান, আবার খুব বেশী পিছিয়েও না যান, বরং তাঁরা যেন তাঁদের অভিযানকালে চরম পরিণামদর্শিতা ও সতর্কতা অবলম্বন করেন। আমি আমার বক্তব্য শেষ করার পর আমীর ও অন্যান্যরা তাঁদের অনুমোদন ঘোষণা করেন এবং আমার পরামর্শকে অত্যন্ত মনোযোগের সাথে মূল্যবান হিসাবে গ্রহণ করে তাঁদের দোয়া ও ধন্যবাদ জানিয়ে প্রস্থান করেন।

এক লাখ হিন্দুকে নির্বিচারে হত্যা

এই সভায় আমীর জাহান শাহ, আমীর সুলায়মান শাহ ও অন্যান্য অভিজ্ঞ আমীররা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, হিন্দুস্তানে প্রবেশের সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত আমরা এক লাখের বেশী কাফের ও হিন্দুকে বন্দী করেছি এবং তারা সবাই আমার শিবিরে রয়েছে। আগের দিন শত্রুরা যখন আমাদের উপর হামলা চালিয়েছিল, তখন এই বন্দীরা আনন্দের লক্ষণ প্রকাশ করেছিল, আমাদের বিরুদ্ধে অভিসম্পাত বর্ষণ করছিল, যখনই আমাদের শত্রুদের সাফল্য দেখতে পেয়েছিল তখনই তাদের সাথে মিলে দাসত্ব শৃঙ্খল ভেঙ্গে আমাদের তাঁবু লুণ্ঠন করে শত্রুর সাথে যোগ দিয়ে তাদের সংখ্যা ও শক্তি বৃদ্ধি করার প্রস্তুতি নিয়েছিল। বন্দীদের ব্যাপারে আমি তাঁদের পরামর্শ চাইলে তাঁরা বলেন যে, যুদ্ধের সেই গুরুত্বপূর্ণ দিনে এই ১লাখ বন্দীকে মালপত্রসহ নিশ্চয় ছেড়ে দেয়া হত না এবং এসব মূর্তিপূজক ও ইসলামের শত্রুদেরকে মুক্তি দিয়ে দেয়া যুদ্ধের নিয়ম-কানুনেরও বিরোধী। প্রকৃতপক্ষে এদের সবাইকে তরবারীর খোরাতে পরিণত করা ছাড়া আর কোন পথ নেই। এসব কথা শোনার পর আমি দেখলাম যে, এসবই যুদ্ধের নিয়ম-কানুন অনুসারেই বলা হচ্ছে। আমি সরাসরি আদেশ দিলাম, তারা যেন শিবির জুড়ে ঘোষণা করে দেয় যে, যার কাছেই কোন কাফের বন্দী রয়েছে সে-ই যেন সেই কাফেরকে হত্যা করে এবং কেউ যদি তা করতে অবহেলা করে তাহলে তাকেই হত্যা করা হবে এবং তার সম্পত্তি খবরদাতাকে দিয়ে দেয়া হবে। এই আদেশ যখন ইসলামের 'গাজী'দের কাছে জানা হয়ে গেল, তখন তারা তরবারী বের করে কাফের বন্দীদেরকে হত্যা করে ফেলল। সেই দিন ১লাখ কাফের, অধার্মিক মূর্তিপূজককে হত্যা করা হয়। মাওলানা নাসিরুদ্দিন ওমর-যিনি তাঁর পুরো জীবনে কখনো একটি চড়ুই পাখিও মারেননি, তিনি এই সময় আমার আদেশ কার্যকর করার জন্য তাঁর তরবারী দিয়ে তাঁর জিন্মায় থাকা পনের জন মূর্তিপূজক হিন্দুকে হত্যা করেন।

নীচ মূর্তিপূজকদের সবাইকে জাহান্নামে পাঠানোর পর আমি আদেশ প্রদান করি, এই অভিযানকালে (ইতিমধ্যে) যত সম্পত্তি, গবাদিপশু ও অশ্ব কজা করা

হয়েছে তা পাহারা দেবার জন্য প্রতি দশজনের একজন শিবিরে অবস্থান করবে, বাকী সৈন্যরা সবাই আমার সাথে রওনা হবে। যোহরের (মধ্যদুপুর) সময়ে রওনা হবার সংকেত দেয়া হল। যমুনা পাড়ি দেবার জন্য যে স্থানটাকে বেছে নেয়া হয়েছিল সেদিকে আমি অগ্রসর হতে থাকি এবং সেখানে তাঁবু ফেলি। সৈন্যবাহিনীর সাথে আসা জ্যোতির্বিদরা তাঁদের বই ও পঞ্জিকা নিয়ে যুদ্ধের জন্য শুভলক্ষণযুক্ত সময়ের ব্যাপারে আলোচনা করেন এবং তারা তারকাদের গতিবিধির নিরীখে কিছু বিলম্ব করার পরামর্শ দেন। বড়-ছোট সব ব্যাপারে আমি আল্লাহর আনুকূল্য ও দয়ার উপরই ভরসা করি। আমি জানি যে, জয় ও বিজয়, পরাজয় ও পলায়ন সবই তাঁর আদেশেই হয়ে থাকে। তাই আমি জ্যোতিষী ও জ্যোতির্বিদদের কথার উপর ভরসা করি না, তবে প্রার্থনা করি, যিনি বিজয় দাতা তিনি যেন আমার বাহকে আনুকূল্য দান করেন।

আমি চাইনি যুদ্ধটি দীর্ঘ সময় ধরে চলুক। তাই রাত্রির অবসান হয়ে যখন সকাল এলো আমি নামাজ আদায়ের জন্য উঠলাম। আমি জামাতের সাথে ফজরের নামাজ আদায় এবং ব্যক্তিগতভাবে প্রার্থনা করলাম, এরপর আমি পবিত্র কোরআন নিলাম— যা আমি সবসময় সাথে রাখি— তা থেকে যুদ্ধ বিষয়ের ফাল (ভাগ্য) দেখার জন্য তা (চোখ বন্ধ করে) খুললাম। কোরআনের যে অংশ আমার সামনে খুললো সেটি মৌমাছি সম্পর্কিত একটি অধ্যায়। সেখানে উপস্থিত ব্যক্তিদের কাছে (আলেমদের কাছে) আমি তাৎক্ষণিকভাবে সুরা(অধ্যায়)টির ব্যাখ্যা জানতে চাইলাম। তাঁরা জবাবে এর অর্থ সম্পর্কে বললেন। আমি এটিকে একটি শুভলক্ষণযুক্ত ইঙ্গিত হিসাবে নিলাম এবং কোরআনের এই নির্দেশের উপর পূর্ণ আস্থা রেখে ও আল্লাহর উপর ভরসা করে সেভাবেই কাজ করে গেলাম।

রবিউল আখির মাসের ৫তারিখ একটি সংকীর্ণ ধারা দিয়ে আমি যমুনা পাড়ি দেই এবং নদীর অপর পাড়ে তাঁবু ফেলি। আমার তাঁবুর চারপাশে যত কাছাকাছি সম্ভব লোকজন মোতায়েনের জন্য আমি আমীর ও অন্যান্য কর্মকর্তাদেরকে আদেশ দেই। শিবিরের চারপাশে যে মাঠটি রয়েছে সেটিকে বিভিন্ন অংশে তাদের মাঝে ভাগ করে দেবার জন্য এবং প্রত্যেকের বরাদ্দ অংশের সামনে অবশ্যই একটি গভীর খাদ খনন করার জন্য আমি নির্দেশ প্রদান করি। বড় ও ছোট সব ধরনের সৈন্যই খাদ খননে নেমে পড়ে। দিনের দুই প্রহরের মধ্যেই শিবিরের চারপাশে খাদ খনন সম্পন্ন হয়ে যায়। আমি অশ্বে চড়ে চারপাশ ঘুরে সেটি দেখি এবং সামনে যত গাছ আছে সব কেটে ফেলে খাদের মধ্যে ফেলার জন্য নির্দেশ দেই। গাছের ডালপালাগুলো এমনভাবে ফেলতে বলি যাতে এর শাখা প্রশাখা শত্রুদের জন্য প্রতিবন্ধক হয় এবং কিছু স্থানে তক্তা বসাতে বলি। আমার সৈন্যদের কানের মধ্যে অবিরত ঢুকানো হয়েছিল যে, হিন্দুস্তানের সৈন্যবাহিনীর

প্রধান ভরসা ছিল তাদের বিশাল বিশাল হাতি, এই জন্তুগুলো সম্পূর্ণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের বাহিনীর আগে আগে চলে, তাদের বিরুদ্ধে তীর ও তরবারী কোন কাজেই আসে না, উচ্চতা ও আয়তনে তারা ছোটখাটো পাহাড়ের মত, তাদের শক্তি এত বেশী যে, এক ইশারায় তারা বড় বড় গাছ উপড়ে ফেলতে পারে, শক্তিশালী দেওয়াল ভেঙ্গে ফেলতে পারে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে তারা তাদের গুঁড় দিয়ে অশ্বারোহীকে অশ্বসহ তুলে শূন্যে ছুঁড়ে মারতে পারে। কিছু সৈন্য সন্দেহ বশতঃ- যা মানুষের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক- তারা যা শুনেছে তার কিছুটা আমার নজরে আনে, তাই আমি যখন ডান ও বামপার্শ্বের এবং মধ্যখানের শাহজাদা ও আমীরদের অধীনে তাদেরকে (সৈন্যদেরকে) স্ব স্ব অবস্থান ঠিক করে দেই, তখন আমি আমার সৈন্যবাহিনীর সাথে আসা অভিজ্ঞ ও ভালোলোকদের কাছে জানতে চাইলাম সেদিনের যুদ্ধে তাদেরকে পাঠানোটা তারা পছন্দ করবে কিনা? তারা বহু অভিযানে আমার সাথে ছিল এবং বহু বড় বড় যুদ্ধ তারা প্রত্যক্ষ করেছে, তবে ভারতের হাতিগুলোর সেইসব গল্প তাদের উপর এতটাই প্রভাব ফেলেছিল যে, তারা সাথে সাথে জবাবে বলে যে, যুদ্ধ যখন এগিয়ে যাবে তখন তাদেরকে জেনানাদের কাছে (অর্থ্যাৎ নিরাপদ অবস্থানে) মোতায়ন করা হলে তারা সেটাই পছন্দ করবে। তাই এই শ্রেণীর লোকদের আশংকা দূর করার জন্য আমি আদেশ দিলাম যে, লুট করে আনা ও মালপত্রের সাথে রাখা সব মোষ আনা হোক। এরপর আমি সেগুলোর মাথা ও গলা তাদের পায়ের সাথে বেঁধে সেই গাছের ডালপালা ও খাদের সামনে পাশাপাশি শুইয়ে রাখার ব্যবস্থা করি।^{১৯}

দিল্লীর সুলতান মাহমুদের পরাজয়

শত্রুর যেকোন ধরনের রাত্রিকালীন আচমকা হামলা প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে সারারাত সতর্কতার সাথে শিবির পাহারা দেবার জন্য আমি আদেশ দেই এবং রাতটি সতর্কতা ও তত্ত্বাবধান- যা যুদ্ধের সময় প্রয়োজন- তার মধ্যদিয়ে কেটে যায়। যখন বিজয়ের প্রভাত প্রস্ফুটিত হল আমি জামাতের সাথে নামাজ আদায় করি এবং সেই কর্তব্য সম্পাদনের পর আমি ঢোল ও যুদ্ধের অন্যান্য বাদ্য বাজানোর নির্দেশ দিই। আমি অশ্বে আরোহণ করে সৈন্যদের সারির সামনে অবস্থান নিয়ে তাদেরকে নেতৃত্ব দান করি। আমি যখন আমার ডান ও বাম পার্শ্বের সৈন্যদল সাজাই তখন ডানপার্শ্বের নেতৃত্ব তুলে দেই শাহজাদা পীর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর, আমীর ইয়াদগার বিরলাস... এর হাতে। বামপার্শ্বের নেতৃত্ব তুলে দেই শাহজাদা সুলতান হোসেন, শাহজাদা খলিল সুলতান, আমীর জাহান শাহ... এর উপর। অগ্রবর্তীদলকে অর্পণ করি শাহজাদা রুমতুম, আমীর শেখ নুরুদ্দিন... এর হাতে। আমি নিজে মধ্যবর্তী দলের সাথে অবস্থান নিই। সৈন্যবাহিনী সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানোর পর আমি অগ্রবর্তীদলকে সামনে এগিয়ে গিয়ে শত্রু সম্পর্কে কিছু খবর নিতে নির্দেশ প্রদান করি। অগ্রবর্তীদলের এক লোক শত্রুদের অগ্রবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত একজনকে ধরে আমার কাছে নিয়ে আসে। শত্রুদের অবস্থান সম্পর্কে আমি তার কাছে জানতে চাইলে সে জানায় যে, সুলতান মাহমুদ যুদ্ধের মনোভাব নিয়েই তাঁর সৈন্যবাহিনী সাজিয়েছেন। তাঁর ডানপার্শ্বের নেতৃত্বে রয়েছেন মুঈনুদ্দিন, মালিক হাদী ও অন্যান্য কর্মকর্তারা। তাঁর বামপার্শ্ব রয়েছে তাগি খান, মীর আলী ও অন্যান্যদের হাতে। সুলতান মধ্যবর্তী দলের সাথে নিজের অবস্থান গ্রহণ করেছেন এবং সম্মুখগ্রহণী হিসাবে কাজ করার জন্য একদল সৈন্য নিযুক্ত করেছেন।^{২০} পুরো বাহিনীতে রয়েছে দীর্ঘঅভিজ্ঞ ১০হাজার অশ্বারোহী এবং ৪০হাজার যুদ্ধপ্রিয় পদাতিক সৈন্য। তাঁর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ১২৫টি হাতিও রয়েছে। এইসব হাতির বেশীরভাগেরই পিঠে হাওদা রয়েছে, সেসব হাওদার মধ্যে রয়েছে হাতবোমা নিক্ষেপকারী (রা'দ-আন্দাজ), আতশবাজি নিক্ষেপকারী (আতশবাজ) এবং ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপকারী (টাকশ আন্দাজ)। এইরূপেই তারা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছে।

শত্রুরা দৃষ্টিসীমায় চলে আসে এবং তাদের শৃঙ্খলার উপর ভালোভাবে দৃষ্টি রাখার জন্য আমি নিকটস্থ একটি টিলার উপর গিয়ে উঠি। সেখান থেকে আমি তাদের সারিগুলোকে সতর্কতার সাথে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করি এবং আমি নিজেকেই বলি যে, ইনশাআল্লাহ (আল্লাহর ইচ্ছায়) আমি তাদেরকে পরাজিত করবো এবং বিজয় লাভ করবো। সেই টিলার উপর আমি ঘোড়া থেকে নেমে নামাজ আদায় করি। আমি মাটিতে সেজদা (মাথা নত করে মাটিতে কপাল ছোঁয়ানো) করি এবং বিজয় দেবার জন্য সর্বশক্তিমানের কাছে মিনতি করি। এটা করার সময় আমি আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে ইঙ্গিত পেলাম (মনে মনে জানা হওয়া) যে, আমার প্রার্থনা আল্লাহ শুনেছেন। আমি তা শেষ করার পর আল্লাহর কাছ থেকে সাহায্য পাবার পূর্ণ আশ্বাস ধারণ করে ঘোড়ায় উঠি। আমি মাঝখানে (সৈন্যদলের) ফিরে এসে রাজকীয় পতাকার নিচে অবস্থান গ্রহণ করি। সে সময় আমি আলী সুলতান তাওয়াচি, আলতুন বকশীসহ অন্যান্যদেরকে তাঁদের সৈন্যদল নিয়ে ডানপার্শ্বকে শক্তিশালী করতে যেতে নির্দেশ প্রদান করি। আমি অন্যান্য কর্মকর্তাদেরকেও তাঁদের লোকজন নিয়ে সম্মুখসারিকে সহায়তা করতে এগিয়ে যেতে নির্দেশ দেই। এটা এইভাবে ঘটলো যে, একই সময়ে ডানপার্শ্বস্থ আমীর ইয়াদগার বিরলাস ও সুলায়মান শাহ এবং সম্মুখসারির আমীর শেখ নুরুদ্দিন ও আমীর শাহ মালিক মনে মনে ভাবছিলেন এবং একে অপরের কাছে মন্তব্য করছিলেন, তাঁরা যদি মাঝখান থেকে কোন ধরনের সৈন্য সহায়তা পান তাহলে তাঁরা সেটাকে বিজয়ের পূর্বলক্ষণ হিসাবে দেখবেন। ঠিক তখনই তাঁদেরকে সহায়তা পাঠাতে সর্বশক্তিমান আল্লাহ সেটাকে আমার মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেন।

অতঃপর দুই সৈন্যদল একে অপরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেল, উভয়পক্ষের রণবাদ্য বেজে চললো, শোর-চিৎকার উঠলো, ময়দান যেন কেঁপে উঠলো এবং উচ্চশব্দে হৈ চৈ শোনা গেল। এই সময় সুনজাক বাহাদুর, সাইয়্যিদ খাজা, আল্লাহদাদ এবং অন্যান্যরা সম্মুখবাহিনী থেকে আলাদা হয়ে পড়েছিলেন এবং যখন বুঝতে পারছিলেন যে, সুলতান মাহমুদের বাহিনী কাছাকাছি চলে এসেছে, তখন তাঁরা ডানদিকে সরে এসে গোপনে তাদের পেছন দিকে গিয়ে অবস্থান নেন। শত্রুবাহিনী যখন কোন ধরনের সংশয় ছাড়াই এগিয়ে আসছিল, তখন তাঁরা গোপনস্থান থেকে দ্রুতবেগে তরবারী উত্তোলন করে বের হয়ে, পেছন দিক থেকে তাঁদের উপর আপতিত হন, ক্ষুধার্ত সিংহ যেভাবে ভেড়ার পালের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিন্নভিন্ন করে দেয়, ঠিক তেমনি তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করে দেন। এই এক আক্রমণেই তাঁরা তাদের ছয়শত জনকে হত্যা করেন। ডানপার্শ্বের নেতৃত্বদানকারী শাহজাদা পীর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর তাঁর নিজের বাহিনী নিয়ে সামনে এগিয়ে যান এবং আমীর সুলায়মান শাহ ও তাঁর সাহসী অশ্বারোহী সৈন্যদলের সাথে শত্রুদের

বামপার্শ্বের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং তাদের উপর অবিরত তীরবৃষ্টি বর্ষণ করেন। তাঁরা সাহসের সাথে তাঘি খানের নেতৃত্বাধীন এই শত্রু সৈন্যদলের উপর আপতিত হন এবং শাহজাদা পীর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর দুঃসাহস ও দৃঢ়প্রত্যয়ের সাথে সেইসব ভয়ংকর হাতির একটির উপর আক্রমণ চালিয়ে তাঁর তরবারীর সাহায্যে গুঁড়টি কেটে দিলে সেটি বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। আমার সাহসী সৈন্যরা শত্রুদের এই দলটির উপর উন্মত্ত হাতির মত অবিরত হামলা চালিয়ে তাদেরকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করে।

শাহজাদা সুলতান হোসেন, আমীর জাহান শাহ, আমীর গিয়াস উদ্দিন ও অন্যান্য আমীরের অধীন আমার সৈন্যবাহিনীর বামপার্শ্ব সাহসিকতার সাথে মালিক মুইনুদ্দিন ও মালিক হাদীর নেতৃত্বাধীন শত্রুদের ডানপার্শ্বের উপর হামলা চালান। তাঁরা তাদের তীক্ষ্ণ তরবারী ও তীব্র তীরের সাহায্যে এমন হামলা চালান যে, শত্রুদেরকে রণেভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেন। জাহান শাহ তাদেরকে ধাওয়া করেন এবং তারা নগরীর (দিল্লীর) দ্বারে না পৌঁছা পর্যন্ত তিনি তাদের উপর বারবার হামলা চালান।

একই সময়ে মালু খান এবং কর্মকর্তা ও সৈন্যসহ মধ্যখানের সৈন্যদল—যাদের সংখ্যা পিপিলিকা ও পঙ্গপালের চেয়েও অনেক বেশী এবং যাদের রয়েছে শক্তিশালী যুদ্ধহাতি—আমার মধ্যস্থলের বাহিনীর উপর হামলা চালায়। শাহজাদা রুমতম, আমীর শেখ নুরুদ্দিন ও অন্যান্যরা দুঃসাহসিক ও দৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তাঁরা যখন এইভাবে ব্যস্ত, তখন তৈমুর তাওয়াচি, মঙ্গলি খাজা ও অন্যান্য আমীররা তাঁদের স্ব স্ব বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসেন এবং শত্রুর উপর হামলা চালান। আমার কাছে অবস্থানরত একদল সাহসী যোদ্ধাকে আমি আদেশ দিলে তারা সম্মুখসারিতে যুদ্ধরত আমীরদের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। তারা তাদের তীরের দ্বারা হাতির মাহুতকে ফেলে দিয়ে তাদেরকে হত্যা করে। এরপর তারা তাদের তরবারীর দ্বারা হাতিগুলোকে আক্রমণ চালিয়ে জখম করে। সুলতান মাহমুদ ও মালু খানের সৈন্যরাও সাহসের কোন কমতি দেখাননি বরং আমার সৈন্যদের পুনঃপুনঃ হামলা প্রতিরোধ করতে না পারা পর্যন্ত তারা লড়াইয়ে সাহসিকতার সাথে কষ্ট সহ্য করেন। অবশেষে নিজেদের দুরবস্থা এবং নিজেদের চারপাশে সৈন্য ও হাতির অবস্থা দেখে তাঁদের সাহসের পতন ঘটে এবং তাঁরা পলায়ন করেন। সুলতান মাহমুদ ও মালু খান হাজারো অসুবিধার মধ্যদিয়ে নগরীতে পৌঁছেন এবং সুরক্ষিত দুর্গের মধ্যে ঢুকে পড়েন।

শাহজাদা খলিল সুলতান একটি তীরের সাহায্যে মাহুতকে ফেলে দিয়ে সুলতান মাহমুদের একটি অন্যতম প্রসিদ্ধ হাতি আটক করেন। তিনি প্রাণীটিকে আমার কাছে নিয়ে আসেন, আমি বালককে আলিঙ্গন করি এবং তাঁকে কিছু

চমৎকার উপহার প্রদান করি, কারণ তাঁর বয়স ছিল মাত্র পনের বছর, তথাপি তিনি এ ধরনের সাহস ও পুরুষত্ব প্রদর্শন করেছেন।

সুলতান মাহমুদের পুরো বাহিনী পরাজিত হয়েছিল, কিছু অংশকে হত্যা করা হয়, কিছু অংশ দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নেয়। আমি বিজয় উল্লাসে দুর্গের দিকে এগিয়ে চলি। এর দ্বারগুলোতে^{২১} পৌঁছে আমি সতর্কতার সাথে এর মিনার ও দেয়ালগুলো পরীক্ষা (পর্যবেক্ষণ দ্বারা) করে দেখার পর হাউজ-ই খাস^{২২} এর পাশে ফিরে আসি। এটি একটি জলাধার, যা তৈরী করেছিলেন সুলতান ফিরোজ শাহ^{২৩} এবং এটি পাথর ও গছ (সিমেন্ট) দিয়ে চারদিক বাঁধানো। এই জলাধারের প্রতিটি পাড় এক ধনুক নিক্ষেপের দূরত্বের চেয়েও বেশী এবং এর চারপাশে দালান-কোঠা রয়েছে। বর্ষাকালে পুকুরটি বৃষ্টির পানিতে পূর্ণ হয় এবং সারা বছর এই পুকুরটি নগরীর লোকদেরকে পানি সরবরাহ দেয়। এর পাড়ে সুলতান ফিরোজ শাহর সমাধি রয়েছে। আমি সেখানে আমার শিবির স্থাপন করার পর শাহজাদা, আমীর ও নুইয়ানগণ এবং সমস্ত সেনাপতি ও কর্মকর্তাগণ সম্মান জানাতে এবং এই বিরাট বিজয়ের জন্য আমাকে অভিনন্দন জানাতে আসেন। শাহজাদা ও আমীরগণের সাথে আমি আলিঙ্গন করি এবং তাঁদের যে উদ্যম ও সাহস— যা আমি নিজে দেখেছি— তার জন্য তাঁদের সবার প্রশংসা করি। সর্বশক্তিমানের কাছ থেকে আমি যে আনুকূল্য, দয়া— আমার অধীনে কর্মরত আমার চমৎকার পুত্রগণ, সাহসী ও সনামধন্য আমীরগণ এবং আমি যেসব বিরাট ও গৌরবময় বিজয় অর্জন করেছি, এসবই যখন আমি স্মরণ করলাম, তখন আমার হৃদয় বিগলিত হয়ে পড়লো এবং আমার দু'চোখ বেয়ে ঝরঝরিয়া অশ্রু ধারা বইতে লাগলো। আমি মাটিতে পড়ে সেজদাবনত হলাম এবং দয়ালু আল্লাহর কাছে শোকরিয়া আদায় (ধন্যবাদজ্ঞাপন) করলাম। সেখানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, সবাই প্রার্থনায় তাঁদের কণ্ঠ উচ্চকিত করলেন এবং আমার সমৃদ্ধি ও আমার রাজত্বের দীর্ঘস্থায়িত্ব কামনা করলেন।

ভারী মালপত্র সে স্থানে নিয়ে আসতে এবং সৈন্যরা যাতে খুবই সতর্ক ও অতন্দ্র থাকে তার জন্য নির্দেশ দেই। সুলতান মাহমুদ^{২৪} এবং মালু খান^{২৫} পরাজিত হবার পর খুবই দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তখন তাঁরা তাঁদের কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ এবং আমার কাছে বশ্যতা স্বীকার না করার কারণে অনুশোচনা করছিলেন। তাই তাঁরা মন্দ পথ পরিহার করেন, যে মন্দ তাঁদের উপরই আপতিত হয়েছিল। তাঁরা দেখলেন, তাঁরা যদি দুর্গে অবস্থান করতে থাকেন তাহলে তাঁরা ধরা পড়বেন এবং বন্দী হবেন, তাই সেদিন ৭ই রবিউল আখির মধ্যরাতে সুলতান মাহমুদ ও মালু খান জাহানপনাহ^{২৬} সেই দুর্গ ত্যাগ করে পার্বত্যাঞ্চল ও জঙ্গলের দিকে পালিয়ে যান। একথা শোনার সাথে সাথে আমি আমীর সাঈদ ও অন্যান্যদেরকে পাঠিয়ে দেই তাঁদেরকে ধাওয়া করার

জন্য। তাঁরা দ্রুততার সাথে তাঁদেরকে অনুসরণ করেন এবং পলাতকদের অনেককে সাথে নিয়ে ফিরে আসেন, তাঁরা তাঁদের অনেককে হত্যা করেন এবং প্রচুর পরিত্যক্ত মালামাল পান। অন্য অনেকের সাথে মালিক শরফুদ্দিন ও রশীদ মালু খানের পুত্র মালিক খুদাই-দাদকে বন্দী করা হয় এবং আমার শিবিরে নিয়ে আসা হয়। দিল্লী থেকে সুলতান ও তাঁর সেনাপতিদের পলায়নের কথা যে রাতে আমি শুনেছিলাম সে রাতেই আমি আমীর আল্লাহদাদ ও অন্যান্য কর্মকর্তাদেরকে হাউজ রানী দরওয়াজা- যেখান দিয়ে মাহমুদ পালিয়ে গিয়েছিলেন এবং বারাকা দরওয়াজা- যেখান দিয়ে মালু খান বাইরে চলে গিয়েছিলেন- সেই দ্বারগুলো প্রহরা দেবার জন্য প্রেরণ করি। এছাড়া আমি অন্যান্য দরওয়াজায়ও লোক পাঠাই, যাতে কোন লোক পালাতে না পারে সেই নির্দেশ সহকারে।

আমি আমার অশ্বে চড়ে ময়দান দরওয়াজার দিকে চলি। আমি ঈদগাহে গিয়ে নামি, সেখানে ছিল একটি আড়ম্বরপূর্ণ ও বৃহৎ দালান এবং সেখানেই আমার আবাস স্থানান্তর করার এবং ঈদগাহে আমার সিংহাসন স্থাপন করার নির্দেশ দেই। আমি সিংহাসনে বসি এবং একটি দরবারের আয়োজন করি। নগরীর সাইয়্যিদ, কাজী, আলেম (ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে বিজ্ঞ), শেখগণ এবং নগরীর বড় বড় মানুষ ও প্রধানরা সমবেত হয়ে আমার দরবারে যোগ দিতে আসেন। আমি একের পর এক তাঁদের সাথে পরিচিত হই এবং তাঁরা অভিবাদন জানান। তাঁদেরকে আমার সিংহাসন চুম্বন করার অনুমতি দেয়া হয়। আমি তাঁদের প্রত্যেককে সম্মান ও দয়া সহকারে অভ্যর্থনা জানাই এবং আসন গ্রহণ করতে বলি। ফজলুল্লাহ বলখী ছিলেন মালু খানের উকিল ও নায়েব। তিনি সুলতান মাহমুদ ও মালু খানের সরকারের একদল কর্মকর্তা ও কেরানী নিয়ে আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন এবং শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এই সময়ে সমস্ত সাইয়্যিদ, ওলামা, শেখ ও অন্যান্য নেতৃস্থানীয় মুসলমানরা দাঁড়িয়ে যান এবং এই রাজপুরুষকে তাঁদের মধ্যস্থতাকারী বানিয়ে অনুনয় করেন যে, দিল্লীর লোকদেরকে আশ্রয় (রেহাই) দেয়া হোক এবং তাদের জীবন রক্ষা করা হোক। সাইয়্যিদ ও আলেমদের প্রতি সম্মান দেখিয়ে- যাঁদেরকে আমি সবসময় অত্যন্ত মর্যাদা ও সম্মান দিয়ে থাকি- আমি নগরীর বাসিন্দাদের জন্য নিরাপত্তা মঞ্জুর করি। আমি তখন দিল্লীর দরওয়াজার উপরে আমার প্রতীকচিহ্ন ও রাজকীয় পতাকা উত্তোলনের এবং ঢাক ও বাজনা বাজানোর আদেশ দেই। এরপর বিজয় উল্লাস চলতে থাকে। আমার সাথে আসা কিছু বুদ্ধিমান ব্যক্তি ও কবি এই বিজয়ের দিনটিকে ছন্দে ছন্দে লিখে আমার সামনে পেশ করেন। এইসব স্মরণীয় ছন্দের মধ্যে মাত্র এই একটি ছন্দ আমার স্মৃতিকথায় উদ্ধৃত করছি-

“বুধবার, দ্বিতীয় রবি’র (রবিউল আখির) আট তারিখ (১৭ ডিসেম্বর, ১৪৯৮),

সম্রাট সাহিব-কিরান দিল্লী নগরী জয় করেন,” ইত্যাদী, ইত্যাদী।

এইসব ছন্দোবদ্ধ কবিতা যারা আমার সামনে পেশ করেছিলেন, সেইসব বিদ্বানব্যক্তি ও কবিকে আমি পুরস্কার এবং মর্যাদা দান করি।

সুলতান মাহমুদ পালিয়ে যাবার সময় যেসব হাতি ফেলে গেছেন সেসব নিয়ে আসার জন্য আমি একদল লোককে নগরীর মধ্যে পাঠাই। তারা গিয়ে ১২০টি প্রকাণ্ড হাতি ও বহুসংখ্যক গণ্ডার পায়, সেগুলো তারা আমার কাছে নিয়ে আসে। হাতিগুলো আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাদের মাহুতদের শেখানো কলাকৌশলের প্রদর্শনী দেখে আমি খুবই মুগ্ধ হই। প্রত্যেকটি হাতি তার মাহুতের ইশারায় মাটির দিকে মাথা বাঁকিয়ে অভিবাদন জানায় এবং সশব্দে চিৎকার করে ওঠে। তাদের মাহুতের নির্দেশনায় তারা তাদের গুঁড় দিয়ে মাটি থেকে যেকোন জিনিস তুলে নিয়ে তা মাহুতের হাতে তুলে দেয় অথবা নিজেদের মুখে ঢুকিয়ে নিয়ে ধরে থাকে। এইসব প্রকাণ্ড জন্তুকে এভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে এবং দুর্বল এক লোকের প্রতি এমন অনুগত দেখে আমি একেবারে তাজ্জব বনে যাই এবং আমি নির্দেশ দেই যে, এইসব হাতিকে তুরান, ইরান, ফার্স, আজার (আজারবাইজান) ও রুমে (তুরস্কে) পাঠিয়ে দেয়া হোক, যাতে আমার সাম্রাজ্য জুড়ে রাজপুরুষ ও বিশিষ্ট ব্যক্তির এই জন্তুগুলোকে দেখতে পায়। সেই অনুসারে আমি হাতিগুলোর ৫টিকে সমরখন্দে, ২টিকে তাবরিজে, ১টিকে শিরাজে, ৫টিকে হিরাতে, ১টিকে সারওয়ানে এবং ১টিকে আজারবাইজানে পাঠিয়ে দেই।

শুক্রবার এলে আমি মাওলানা নাসির উদ্দিন ওমরকে এবং আমার শিবিরের সাথে আসা আরো কয়েকজন আল্লাহওয়াল্লা ও আলেম (জ্ঞানী)কে এই নির্দেশনা সহকারে জামে মসজিদে পাঠাই যে, তাঁরা সেখানে জুমা নামাজ আদায় করবেন এবং রাজধানী দিল্লীতে আমার শাসন কায়েমের কথা ঘোষণা করে খুৎবা পাঠ করবেন। সে অনুসারে দিল্লী নগরীর এই মসজিদের মিম্বর (সিঁড়ির মত তিন ধাপ বিশিষ্ট দাঁড়ানোর যে উচ্চস্থানে দাঁড়িয়ে ইমাম খুৎবা পাঠ করেন) থেকে আমার নামে খুৎবা পাঠ করা হয় এবং আমি ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদেরকে দামি পোশাক ও উপহারাদি পুরস্কারস্বরূপ প্রদান করি।

দিল্লীতে একটি দরবার বসানোর প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে আমি শাহজাদা, আমীর, নুইয়ান ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ এবং সাইয়্যিদ, আলেম-ওলামা, শেখ ও নগরীর সমস্ত প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণকে এই দরবারে যোগ দেয়ার আদেশ দেই। তাঁরা সবাই এসে গেলে আমি প্রবেশ করি এবং মসনদের উপর আসন গ্রহণ করি। তুর্কী ও তাজিক বাদ্যকর ও গায়করা বাজাতে ও গাইতে শুরু করে। শরাব, শরবত,

মিষ্টি এবং সবধরনের রুটি ও গোশ্ত পরিবেশন করা হয়। আমি শাহজাদা, আমীর ও আমার সৈন্যবাহিনীর অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে, বিশেষকরে সেইসব সাহসী ব্যক্তিদেরকে, যারা আমার নিজের পর্যবেক্ষণে সাহসিকতাপূর্ণ কাজের মাধ্যমে নিজেদেরকে বিশিষ্টতায় উন্নীত করেছেন— তাঁদেরকে দামি পোশাক, টুপি, কটিবন্ধ, তরবারী, ছুরি ও অশ্ব ইত্যাদী ইত্যাদী প্রদান করি। কাউকে কাউকে আমি সৈন্যবাহিনী প্রদান করি এবং তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি করি। সাইয়্যিদ ও আলেম-ওলামাদেরকে আমি পোশাক ও উপহারাদি প্রদান করি। হিন্দুস্তানে আমার বিজয় ঘোষণা করে বার্তা তৈরী করে তা আমার সাম্রাজ্য জুড়ে খুব দ্রুত প্রচার করে দেবার জন্য আমি আমার মুন্সি (সচিব বা সহকারী)দেরকে নির্দেশ প্রদান করি। আমি আমার রাজস্ব কর্মকর্তাদেরকে নির্দেশ দেই তাঁরা যেন নগরীটির উপর একটি হিসাব-নিকাশ করে মুক্তিপণের টাকা সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করেন, তবে সাইয়্যিদ, আলেম ও শেখদেরকে যেন তা থেকে রেহাই দেন। অর্থ সংগ্রহকারীরা তাঁদের কাজ শুরু করে দেন। আমি সেই একই আবাসে বহুদিন অবস্থান করি, সেখানে দরবার বসাই, ভোজউৎসব করি এবং নানা ধরনের আনন্দ-উৎসবে অংশগ্রহণ করি।

দিল্লী নগরী লুণ্ঠন

মাসের ১৬ তারিখ এমন কিছু ঘটনা ঘটে যার দরুন দিল্লী নগরী লুণ্ঠিত হয় এবং এর বেশকিছু কাকের বাসিন্দা গণহত্যার শিকার হয়। একটি ঘটনা হচ্ছে, ভয়ংকর তুর্কী সৈন্যদের একটি দল দিল্লী নগরীর দ্বারগুলো দেখার জন্য একটি দ্বারে সমবেত হয়ে নিজেরা নিজেরা মজা করছিল এবং তাদের কেউ কেউ বাসিন্দাদের মালপত্রের দিকে সহিংসভাবে হাত বাড়িয়েছিল। এই সহিংসতার কথা আমি শোনার পর তুর্কীদেরকে সংযত করার জন্য নগরীতে উপস্থিত কিছু আমীরকে সেখানে পাঠিয়ে দেই। একদল সৈন্য এইসব আমীরের সাথে নগরীর মধ্যে যায়। আরেকটি কারণ ছিল যে, আমার হারেমের কিছু মহিলা নগরীর ভেতর যেতে এবং জাহানপনাহ নামে পরিচিত দুর্গে মালিক জৌনা^{২৭} কর্তৃক নির্মিত হাজার সুতুন (এক হাজার স্তম্ভ বিশিষ্ট) প্রাসাদ দেখতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। আমি এই অনুরোধ মঞ্জুর করি এবং মহিলাদের পাঙ্কী পাহারা দিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একদল সৈন্য পাঠাই। আরেকটি কারণ ছিল, নগরীর উপর ধার্যকৃত কর আদায়ের জন্য জালাল ইসলাম ও অন্যান্য দেওয়ানরা একদল সৈন্য নিয়ে নগরীতে গিয়েছিলেন। অন্য আরেকটি কারণ হচ্ছে, শস্য, তেল, চিনি ও আটা সংগ্রহ করার আদেশপ্রাপ্ত হাজার খানেক সৈন্য সেগুলো সংগ্রহ করার জন্য নগরীতে গিয়েছিল। আরেকটি কারণ হল, আমাকে জানানো হয়েছিল, দেশটির চারিদিক থেকে বিপুল সংখ্যক হিন্দু ও গেবর তাদের স্ত্রী ও সন্তান এবং মালপত্র ও মূল্যবান জিনিস নিয়ে নগরীতে এসেছিল। আমি তা জানতে পেরে সাথে সাথে কিছু আমীরকে তাদের সৈন্যদল (কুশুন)সহ নগরীতে পাঠিয়ে দেই এবং বাসিন্দাদের আপত্তির দিকে না তাকিয়ে তাদের মালামাল আটক করে এইসব পলায়নপর লোকদেরকে বের করে দেবার জন্য নির্দেশ দেই। এই ধরনের বহু কারণে বিপুল সংখ্যক ভয়ংকর তুর্কী সৈন্য নগরীর মধ্যে অবস্থান করছিল। সৈন্যরা এই নগরীতে পালিয়ে আসা হিন্দু ও গেবরদেরকে ধরার জন্য এগিয়ে গেলে তাদের অনেকে তাদের তরবারী বের করে বাধা দেয়। এতে সংঘাতের অগ্নি জ্বলে ওঠে এবং জাহানপনাহ ও সিরি থেকে

পুরনো দিল্লী পর্যন্ত তা ছড়িয়ে পড়ে, যেখানে যেখানে এই আগুন পৌঁছেছে সেখানেই সবকিছু জ্বালিয়ে দিয়েছে।^{২৮} বর্বর তুর্কীরা হত্যাকাণ্ড এবং লুণ্ঠনে লিপ্ত হয়ে পড়ে। হিন্দুরা তাদের নিজেদের হাতে তাদের বাড়ী-ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে স্ত্রী ও সন্তানদের পুড়িয়ে ফেলার পর লড়াই করার জন্য অবতীর্ণ হয় এবং নিহত হয়। নগরীর হিন্দু ও গেবররা লড়াইয়ে খুব তৎপরতা ও সাহস প্রদর্শন করে। নগরীর দ্বারগুলোর দায়িত্বপ্রাপ্ত আমীররা আরো কোন সৈন্য যাতে সেই স্থানে প্রবেশ করতে না পারে তার ব্যবস্থা করেছিলেন, তবে যুদ্ধের আগুন এত উচ্চে উঠে গিয়েছিল যে, তাদেরকে অবদমিত করার ব্যাপারে এই সাবধানতা কোন কাজে আসেনি। সেইদিন বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার পুরো রাত ১৫ হাজারের মত তুর্কী হত্যাকাণ্ড, লুণ্ঠন ও ধ্বংস সাধনে লিপ্ত হয়েছিল। শুক্রবার যখন সকাল হল, আমার সমস্ত সৈন্যদল নিয়ন্ত্রণ হারা হয়ে নগরীর মধ্যে চলে যায় এবং হত্যাকাণ্ড, লুণ্ঠন ও বন্দীকরণ ছাড়া আর কিছু তাদের মাথায় ছিলনা। সেদিন সারাদিন লুণ্ঠন চলে সর্বত্র। পরদিন শনিবার, ১৭ তারিখও একইভাবে চলতে থাকে এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ও বন্দী এত বিশাল ছিল যে, একেক জন সৈন্য পঞ্চাশ থেকে একশত জন করে পুরুষ, নারী ও শিশু বন্দী ভাগে পেয়েছিল। কুড়ি জনের কম পেয়েছে এমন কোন লোক ছিল না। চুনিপাথর, হীরা, মণি (ডালিম দানার মত), মুক্তা ও অন্যান্য রত্ন, স্বর্ণ ও রৌপ্যের জহরত (অলংকার), আশরাফী, বিখ্যাত আলাই^{২৯} মুদ্রার স্বর্ণ ও রৌপ্যের আশরাফী ও টংকা, স্বর্ণ ও রৌপ্যভর্তি পাত্র এবং মহামূল্যবান বুটিদার রেশমীকাপড় ও রেশমসহ অন্যান্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ পাওয়া গিয়েছিল বিশাল পরিমাণ। হিন্দু মহিলাদের স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলংকার পাওয়া গিয়েছিল বেস্তমার। সাইয়্যিদ, আলেম ও অন্যান্য মুসলমানদের বাড়ী-ঘর ছাড়া পুরো নগরীই লুণ্ঠিত হয়েছিল।^{৩০} এই নগরীর লোকদের জন্য এই ধরনের পরিণতি তাদের ভাগ্যে লেখা ছিল। যদিও আমি তাদেরকে রেহাই দিতে ইচ্ছুক ছিলাম, আমি সে ব্যাপারে সফল হতে পারলাম না, কারণ এটা আল্লাহরই ইচ্ছা ছিল যে, এই নগরীর উপর এই ধরনের চরম দুর্দশা আপতিত হবে।

পরদিন রবিবার আমাকে জানানো হল যে, বিপুল সংখ্যক কাফের হিন্দু পুরনো দিল্লীর জামে মসজিদে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সমবেত হয়েছে এবং আত্মরক্ষার প্রস্তুতি নিয়েছে। আমার কিছুলোক কাজে-কর্মে সেই পথে যাবার সময় তাদের দ্বারা জখম হয়েছে। আল্লাহর ঘরকে কাফের ও মূর্তিপূজকদের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য তক্ষুণি একদল লোক নিয়ে এগিয়ে যেতে আমি আমীর শাহ মালিক ও আলী সুলতান তাওয়াচিকে নির্দেশ দেই। সেই অনুসারে তাঁরা গিয়ে কাফেরদেরকে আক্রমণ এবং হত্যা করেন। তখন পুরনো দিল্লীও লুণ্ঠিত হয়।

কারিগর ও মিল্লী- যারা স্ব স্ব হাতের কাজে ওস্তাদ ছিল- তাদেরকে বন্দীদের মধ্য থেকে আলাদা করে এক পাশে রাখার জন্য আমি আদেশ দেই, সেই অনুসারে কয়েক হাজার হাতের কাজের কারিগরকে বাছাই করে আমার আদেশের জন্য অপেক্ষমান রাখা হয়েছিল। এদের সবাইকে আমি শাহজাদা ও আমীরগণ- যাঁরা উপস্থিত ছিলেন- অথবা যাঁরা আমার সাম্রাজ্যের অন্য কোথাও সরকারীভাবে ব্যস্ত রয়েছেন তাঁদের মাঝে বন্টন করে দেই। আমি আমার সাম্রাজ্যের রাজধানী সমরখন্দে একটি জামে মসজিদ তৈরী করার স্থিরসংকল্প করি, এটি হবে যে কোন দেশের মসজিদের সাথে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাই আমার নিজের বিশেষ কাজের জন্য সকল গৃহনির্মাণ শ্রমিক^{৩১} ও রাজমিল্লী আলাদাভাবে ভাগ করারও নির্দেশ দেই।

আব্লাহর ইচ্ছায় এবং আমার কোন ইচ্ছা বা নির্দেশনা না থাকা সত্ত্বেও দিল্লীর তিনটি নগরীই- সিরি, জাহানপনাহ ও পুরনো দিল্লী যাদের নাম- লুষ্ঠিত হয়েছে। আমার সর্বময় কর্তৃত্বের খুৎবা- যা কিনা বাসিন্দাদের জন্য নিরাপত্তা ও সুরক্ষার আশ্বাসস্বরূপ- তা নগরীতে পাঠ করা হয়। এই স্থানের জনগণের উপর অনিষ্টকর কিছু না ঘটুক এটাই ছিল আমার একান্ত ইচ্ছা। কিন্তু এটা আব্লাহরই আদেশ ছিল যে, নগরীটি ধ্বংস হবে। অতঃপর তিনিই কাকের বাসিন্দাদেরকে প্রতিরোধের চেতনায় উৎসাহিত করে তুলেছিলেন, তাই তারা নিজেদের উপর সেই অবধারিত দুর্ভাগ্য টেনে নিয়েছিল।

দিল্লীর জনগণের ধ্বংসযজ্ঞের সেই ব্যাপারটা আমার মনের মধ্যে আর পুষে না রেখে আমি নগরীগুলোর চারিদিকে অস্বারোহণে ঘুরতে বের হই। সিরি একটি গোলাকার শহর। এর দালানগুলো আড়ম্বরশালী (উচ্চও বটে)। সেগুলো চারিদিকে সুরক্ষিত, পাথর ও ইটে তৈরী এবং খুবই শক্তিশালী। পুরনো দিল্লীতেও একই ধরনের একটি দুর্গ রয়েছে, তবে এটি সিরির দুর্গের চেয়ে বড়। সিরির দুর্গ থেকে পুরনো দিল্লীর দুর্গ পর্যন্ত বেশ অনেকখানি দূরত্ব রয়েছে, এই দূরত্বটি একটি দেয়াল দ্বারা ঘেরা, দেয়ালটি পাথর ও সুরকি দিয়ে তৈরী। যে অংশটিকে 'জাহানপনাহ' বলা হয় সেটি এই জনঅধ্যুষিত নগরীর মাঝখানে অবস্থিত। এই তিন নগরীর দেয়ালঘেরা সুরক্ষা ব্যবস্থার রয়েছে ৩০টি দ্বার। জাহানপনাহ'র রয়েছে ১৩টি দ্বার, পূর্বদিকে মুখ করে দক্ষিণ দিকে রয়েছে ৭টি এবং পশ্চিমদিকে মুখ করে উত্তর দিকে রয়েছে ৬টি দ্বার। সিরির রয়েছে ৭টি দ্বার, ৪টি রয়েছে বাইরের দিকে মুখ করে এবং ৩টি রয়েছে ভিতর দিকে জাহানপনাহ'র দিকে মুখ করে। দিল্লীর রয়েছে ১০টি দ্বার, কিছু বহির্মুখি এবং কিছু নগরীর দিকে অন্তর্মুখি। নগরী পর্যবেক্ষণ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে আমি জামে মসজিদে যাই, সেখানে একটি ধর্মসভায় সাইয়িদ, উকিল, শেখ এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান মুসলমানরা নগরীর সেই অংশের বাসিন্দাদের সাথে জড়ো হয়েছিলেন। আমি

তাঁদেরকে আমার সামনে আসতে বলি, তাঁদেরকে সান্ত্বনা দেই, তাঁদেরকে সব ধরনের মর্যাদা দেই এবং তাঁদেরকে অনেক উপহার ও সম্মান প্রদান করি। নগরীস্থ তাঁদের আবাস রক্ষা করার জন্য এবং কেউ যাতে তাঁদের ত্যক্ত করতে না পারে তা পাহারা দেবার জন্য আমি একজন কর্মকর্তাকে নিযুক্ত করি। এরপর আমি আবারো ঘোড়ায় চড়ে আমার আবাসে ফিরে আসি।

দিল্লী জয়ের পর কাফেরদের বিরুদ্ধে অভিযান

আমি দিল্লীতে পনের দিন ছিলাম, এই সময়টি আমি পার করেছি আনন্দ-উৎসব উপভোগ, রাজকীয় দরবার বসানো ও মহাভোজ দেবার মধ্যদিয়ে। অতঃপর বিবেচনা করে দেখলাম যে, আমি হিন্দুস্তানে এসেছি কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এবং আমার এই অভিযান এমনভাবে রহমত (আল্লাহর আশীর্বাদ)প্রাপ্ত যে, আমি যেখানেই গিয়েছি সেখানেই জয়ী হয়েছি। আমি আমার প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করেছি, আমি কয়েক লাখ কাফের ও মূর্তিপূজককে হত্যা করেছি এবং আমি আমার ধর্মাস্তরকরণের তরবারী ঈমানের শত্রুদের রক্তে রঞ্জিত করেছি। এখন এই বিজয়ের অভিষেক সম্পন্ন হয়েছে এবং আমি অনুভব করলাম, আমি আরামের মধ্যে নিজেকে ভাসিয়ে দেয়া উচিত হবে না, বরং হিন্দুস্তানের কাফেরদের বিরুদ্ধে আমার যুদ্ধের শক্তির প্রকাশ ঘটানোর এই প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়া উচিত।

২২শে রবিউল আখির আমার মনের মাঝে এই ভাব জাগরিত হবার পর আমি আবারো একটি জেহাদ (ধর্মযুদ্ধ) শুরু করার জন্য আমার তরবারী উত্তোলন করি। আমি দিল্লী থেকে যাত্রা শুরু করি এবং তিনকোশ পথ চলার পর ফিরোজাবাদ দুর্গে পৌছি, যেটি যমুনা নদীর তীরে দাঁড়িয়ে এবং এটি সুলতান ফিরোজ শাহ কর্তৃক নির্মিত একটি অন্যতম অট্টালিকা। সেখানে আমি থামি এবং স্থানটি পরীক্ষা করার জন্য ভিতরে যাই। আমি জামে মসজিদের দিকে এগিয়ে যাই, সেখানে নামাজ আদায় করি এবং সর্বশক্তিমানের প্রতি তাঁর অসীম দয়ার জন্য প্রশংসা করি ও শোকর (ধন্যবাদ জ্ঞাপন) আদায় করি। এরপর আমি আবারো অশ্বারোহণ করি এবং জাহান-নুমা প্রাসাদের কাছে আমার শিবির স্থাপনের জন্য এগিয়ে যাই। এইদিন সাইয়্যিদ শামসুদ্দিন তুরমুজী এবং আলাউদ্দিন নায়েব কারকারি আমার শিবিরে ফিরে আসেন। আমি তাঁদেরকে দূত হিসাবে কুটিলার^{৩২} নগরীতে বাহাদুর নাহিরের কাছে পাঠিয়েছিলাম। তাঁরা আমার কাছে বাহাদুরের লিখিত একটি পত্র হস্তান্তর করেন। বাহাদুর অত্যন্ত সম্মানজনক ভাষায় আমার কাছে পত্রটি লিখেছিলেন। পত্রটি নিরূপ: “আমি মহান আমীরের^{৩৩} খুবই তুচ্ছ এক সেবক

এবং আমি তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য তাঁর দরবারের দিকে অগ্রসর হব।” দূতরা আমাকে জানায় যে, বাহাদুর নাহির শুক্রবার আমার দরবারে হাজির হবেন। বাহাদুর নাহির শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ আমার কাছে এমন দুইটি সাদা তোতাপাখি পাঠান যেগুলো ভালোভাবে কথা বলতে পারে, যা সুখকর। দূতরা সেই দুইটি পাখি আমার সামনে হাজির করে বলেন যে, এই দুইটি তোতাপাখি সুলতান তুঘলক শাহের কাছে ছিল এবং সেই থেকে এই দুইটি পাখি পরবর্তী সুলতানদের দরবারেই থাকতো। তোতাপাখি দুইটির উপস্থিতি এবং তাদের আওয়াজ আমাকে খুবই সন্তুষ্টি দান করলো। তাই আমি নির্দেশ দিলাম, পাখি দুইটিকে প্রতিদিন খাঁচায় করে আমার সামনে যেন আনা হয়, যাতে আমি তাদের কথা শুনতে পাই।

পরদিন আমি যমুনা পাড়ি দেই এবং মুদুলা গ্রামের দিকে ৬ ক্রোশ পথ চলি। সেখানে থেমে আমি তাঁবু ফেলি। পরদিন শুক্রবার, আমি আবার পথ চলা শুরু করি এবং ৫ বা ৬ ক্রোশ যাবার পর কাটাহ গ্রামে পৌঁছে শিবির স্থাপন করি। বাহাদুর নাহির তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র কালনাশকে সাথে নিয়ে সম্মান জ্ঞাপন করতে আসেন এবং আমি যথাযোগ্য সৌজন্য সহকারে তাঁদেরকে অভ্যর্থনা জানাই। তাঁরা হিন্দুস্তানের দুর্লভ ও যথোপযুক্ত উপহার আনেন, তবে আমি সেই তোতাপাখি দুইটিকেই সবচেয়ে উত্তম উপহার হিসাবে দেখি। তাঁদের কথা ও কাজ থেকে তাঁদের অকপটতা নিরূপন করার পর আমি তাঁদেরকে আমার রাজকীয় আনুকূল্য ও বদান্যতা দ্বারা সম্মানিত করি এবং তাঁদের মর্যাদা উন্নীত করি, আমি তাঁদের মন থেকে সমস্ত সন্দেহ ও ভীতি দূর করি। পরদিন আমি আবার পথচলা শুরু করি এবং ৬ ক্রোশ যাবার পর বাঘপথে এসে উপস্থিত হয়ে সেখানে শিবির স্থাপন করি। পরদিন রবিবার, মাসের ২৬ তারিখ আমি আবার চলতে শুরু করি এবং ৫ ক্রোশ ভ্রমণ করার পর আসর নামক গ্রামে এসে পৌঁছি, এটি দোয়াব নামে পরিচিত অঞ্চলে^{৩৪} অবস্থিত।

মিরাট দখল

এই সময় আমাকে জানানো হল, সামনেই মিরাট নামে একটি নগরী, সেখানে খুবই শক্তিশালী একটি দুর্গ রয়েছে। সেই দুর্গ নগরীটি হিন্দুস্তানের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী দুর্গগুলোর অন্যতম এবং এটি ইলিয়াস আফগান ও তাঁর পুত্র মাওলা আহমদ খানের নেতৃত্বাধীন। সেখানে বিশাল সংখ্যক গেবর (বিধর্মী) সাথে নিয়ে সাফি নামে একজন গেবর দুর্গটির প্রতিরক্ষার জন্য সেখানে রয়েছেন। তাদের কাছে যুদ্ধের প্রচুর সাজ-সরঞ্জামও রয়েছে। এসব শুনে আমি সাথে সাথে শাহজাদা রুস্তম, আমীর তাঘি বুঘা, আমীর শাহ মালিক এবং আমীর আব্বাহাদকে এই নির্দেশ সহকারে সেখানে পাঠিয়ে দেই যে, যদি সেখানকার বাসিন্দারা যথাযথ বশ্যতা ও আনুগত্য প্রদর্শন করে তাহলে তাদেরকে শর্ত মঞ্জুর করা যাবে, তবে যদি তারা তা না করে তাহলে যেন আমার কাছে খবর পাঠান এবং স্থানটি দখল করার জন্য এগিয়ে যান। মাসের ২৬ তারিখ এইসব কর্মকর্তারা পথচলা শুরু করেন এবং মিরাটে পৌঁছে আমার বার্তা প্রচার করেন, তাঁরা সেখানকার বাসিন্দাদেরকে শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ করার এবং তাদের প্রাণ, সম্পত্তি ও সম্মান আমার হেফাজতে ন্যস্ত করার আহবান জানান। তারা জবাব দেয় যে, তারমশারিন খান অগুনতি সৈন্য নিয়ে এই দুর্গটি আক্রমণ করেছিলেন, কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছেন। বাসিন্দাদের এই উদ্ধত জবাবের খবর আমার দূতরা আমার কাছে লিখে পাঠান। এসব লোকেরা একজন মহান বাদশাহ তারমশারিন খানের ব্যাপারে যে অপমানজনক দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছে তা যখন আমি পড়লাম তখন আমার ক্রোধ জেগে উঠলো, আমি আমার অশ্ব আরোহণ করলাম এবং মিরাটের বিরুদ্ধে পথচলা শুরু করার জন্য আমার সৈন্যবাহিনীকে নির্দেশ দিলাম। সেইদিনই মাসের ২৮ তারিখ যোহরের নামাজের পর আমি ১০হাজার বাছাইকরা অশ্বারোহী নিয়ে পথচলা শুরু করি। সেই রাত রাত্তায় বিরতি দিয়ে আমি ২০ ক্রোশ দূরত্ব সম্পন্ন করি এবং ২৯ তারিখ মিরাট পৌঁছি।

বিকাল বেলা আমি আমার কর্মকর্তাদেরকে আদেশ দেই, তাঁরা যেন রাস্তা, পরিখা ও সেতু নির্মাণে দক্ষ সৈন্যদলগুলোকে দুর্গের দেয়ালের নিচে গর্ত খননের

কাজে লাগিয়ে দেন। এই আদেশানুসারে তারা কাজে লেগে যায় এবং এক রাতের মধ্যে প্রত্যেক দল দেয়ালের নিচে ১২গজ পর্যন্ত খনন করে সুরঙ্গ বানিয়ে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়। দুর্গে অবরুদ্ধরা যখন এটা দেখতে পেয়ে সমস্ত মনোবল হারিয়ে ফেলে। তারা একেবারে ভেঙ্গে পড়ে এবং হতবুদ্ধি হয়ে যায়। এই সময় আমীর আল্লাহদাদ কুচিনের নিবেদিতপ্রাণ সৈন্যদল দুর্গের দ্বারে গিয়ে আঘাত করে, রণচিংকারের সাথে তারা সবেগে সেটাতে হামলা চালায়। আমীর আল্লাহদাদের অনুসারীদের একজন কালান্দার বাহাদুরের পুত্র সারাই বাহাদুরই প্রথম দেয়াল বেয়ে ওঠার জন্য একটি মই নিয়ে আসে, সেটিকে দেয়ালের সাথে লাগিয়ে সেটি বেয়ে দেয়ালের উপর উঠে পড়ে। তাকে সহায়তা করার জন্য একদল সাহসী লোক সেখানে সমবেত হয় এবং মই ও দড়ির সাহায্যে তারা দেয়াল বেয়ে উঠে দুর্গের ভিতর ঢুকে পড়ে। এরপর তারা দুর্গের ভিতর ছড়িয়ে পড়ে এবং তেজস্বীতা ও সাহসিকতার সাথে লড়াই করে। রক্তময় বিরলাস অবশেষে ইলিয়াস আফগান ও তার পুত্র মাওলানা^{৩৩} আহমেদ থানেশ্বরীর মুখোমুখি হন। তিনি সাহসের সাথে যুদ্ধ করে তাদের উভয়কে বন্দী করেন। এরপর তাদের গলার সাথে তাদের হাত বেঁধে আমার সামনে নিয়ে আসেন। খুব ভালোভাবে লড়াই করে সাফি নিহত হন। আমার বাহিনীর সাহসী সৈন্যরা দুর্গটির প্রত্যেক অংশে ছড়িয়ে পড়ে সেখানকার সমস্ত গেবর ও অন্যান্য লোকজনকে হত্যা করে। তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের বন্দী এবং তাদের সম্পত্তি লুণ্ঠ করা হয়। মিরাতের এই জয় আমার মনকে প্রশান্তি দেয়।

দুর্গের দেয়াল খনন করার কাজের জন্য দেয়ালের নিচে যেসব কাঠ ঠেকনা হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল সে সবে আগুন ধরিয়ে দিতে এবং সমস্ত মিনার ও দেয়াল মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে আমি নির্দেশ প্রদান করি। গেবরদের বাড়ীঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয় এবং বড় বড় দালানগুলো ভূমিসাৎ করে দেয়া হয়। আল্লাহর তরফ থেকে সাহায্য এভাবেই আমাকে মিরাতে একটি সহজ জয় লাভে সক্ষম করে। এটি এমন এক স্থান, যা এক মহান মর্যাদা সম্পন্ন ও ক্ষমতাধর রাজপুরুষ তারমশারিন বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে অবরোধ করেও দখল করতে পারেননি। আমি একটি ছোট সৈন্যদল নিয়ে এই স্থানে দ্রুত এসে পড়েছিলাম এবং আমার সাহসী সহযোদ্ধারা নির্ভেজাল সাহস ও দৃঢ়প্রত্যয়ের মাধ্যমে প্রকাশ্য দিবালোকে দুর্গের দেয়ালে মই লাগিয়ে সেটি বেয়ে উঠে তরবারীর মুখে স্থানটি নিয়ে নিয়েছে। সাফল্যের এই নিদর্শন দানের জন্য সর্বশক্তিমানের কাছে আমি ভক্তিসহকারে শোকরিয়া আদায় করি।

গঙ্গায় যুদ্ধ

১লা জমাদিউল আউয়াল আমি আমার সৈন্যবাহিনীর বামপার্শ্বকে আমীর জাহান শাহর সেনাপতিত্বাধীনে ন্যস্ত করে যমুনার পাড় ধরে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়ে বলি, তিনি যেখানেই যাবেন সেখানকার প্রত্যেকটি দুর্গ, শহর ও গ্রাম দখল করে নেবেন এবং দেশটির প্রত্যেক কাফেরকে তরবারী দ্বারা খতম করে দেবেন। আমার আদেশ কার্যে পরিণত করার জন্য সেই আমীর তাঁর সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে বেরিয়ে পড়েন। আমি শেখ নুরুদ্দিনকে ভারী মালপত্রের দায়িত্ব দিয়ে কারাসু^১ নদীর তীর পর্যন্ত বহন করে নিয়ে যাবার জন্য নির্দেশ দেই। আমি নিজে আমার সরাসরি অধীন সৈন্যবাহিনী নিয়ে গঙ্গা নদী এলাকার কাফেরদের বিরুদ্ধে এগিয়ে যাবার মনঃস্থির করি। সে অনুসারে আমি নদীটির দিকে পথচলা শুরু করি, সেটি ছিল মিরাত থেকে ১৪ ক্রোশ দূরে। মালপত্রের সাথে রেখে যাওয়া আমীর সুলায়মান শাহ পরে আমার আদেশ মতে চলে আসেন এবং তাঁর সৈন্যদল নিয়ে পথচলায় আমার সাথে যোগ দেন। প্রথমদিন আমি ৬ ক্রোশ পথ চলি এবং রাত্রি যাপনের জন্য মনসুরা গ্রামে থামি। পরদিন, মাসের ২ তারিখ খুব সকালে আমি পিরোজপুর এসে পৌছি এবং নদীর ক্ষীণধারার খোঁজে (পার হবার সুবিধার জন্য) নদীর পাড় ধরে ২ বা ৩ ক্রোশ অগ্রসর হই। সকালে নাস্তার সময়ে আমি পারাপারের একটি ঘাটে এসে পৌছি, তবে ক্ষীণধারা বা সরুস্থানের খোঁজ পেলাম না। আমার লোকদের একটি দল অশ্বারোহণে নদীতে নেমে পড়ে এবং সাঁতারিয়ে পার হয়ে যায়। আমিও সেই একইভাবে পার হবার জন্য আমার অশ্বকে পানির দিকে চালিয়ে দিচ্ছিলাম, এমন সময় আমীর ও নুইয়ানরা দৌড়ে এসে পেশ করলেন যে, শাহজাদা পীর মোহাম্মদ ও আমীর জাহান শাহ সৈন্যবাহিনীর ডান পার্শ্বের সৈন্যদের নিয়ে পিরোজপুরের কাছে নদী পার হয়েছেন এবং এই একইদিন নদী পাড়ি না দেয়াই আমার জন্য যুক্তিযুক্ত হবে। তাঁদের নিবেদনের প্রতি আমি সম্মতি জানাই এবং নদীর পাড়েই শিবির স্থাপন করি, তবে আমীর জাহান মালিক ও শাহজাদা শাহরুখের সৈন্যদলের সাথে যুক্ত অন্যান্যদেরকে নদী পার হতে এবং রাতটি সে পাড়েই কাটাতে নির্দেশ দেই। পরদিন, মাসের ৩ তারিখ আমি নদীর

পাড় ধরে তুঘলকপুর পর্যন্ত ১৫ক্রোশ দূরত্বের পথচলা শুরু করি এবং সেই স্থানটি যখন আর ৫ক্রোশ দূরে তখন খবর পাই যে, নদীর সরুধারার স্থানে কাকের হিন্দুদের একটি বিশাল দল সমবেত হয়েছে। আমি তখনই মুবান্ধার বাহাদুর ও আলী সুলতান তাওয়াচিকে ৫হাজার অশ্বারোহী নিয়ে এইসব কাকেরকে কঠোরভাবে শাস্তা করতে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দেই এবং আমি তুঘলকপুরের দিকে আমার রাস্তায় এগুতে থাকি। আমি যখন যাচ্ছিলাম, তখন বায়ুমণ্ডল ও চলমান বাতাস দ্বারা আমি আক্রান্ত হই এবং আমার ডান বাহুতে ব্যথা অনুভব করি, যা মুহূর্তে মুহূর্তে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এটি আমাকে খুবই ভোগায় এবং এর ফলে আমি গরম পথ্য^{৩৭} কয়েকবার প্রয়োগ করি। এ সময় আমাকে খবর দেয়া হয় যে, হিন্দুদের একটি বাহিনী যুদ্ধংদেহী হয়ে ৪৮টি নৌকায় করে নদী পথে আসছে। এই গোয়েন্দা সংবাদ আমার ব্যথার উপশমের দাওয়াই হিসাবে কাজ করলো এবং যুদ্ধ করার আশ্রহ আমাকে ব্যথার কষ্টের কথা ভুলিয়ে দিলো। আমি ঘোড়ায় উঠে পড়ি এবং হাতের কাছে থাকা এক হাজার ঘোড়সওয়ার সৈন্যকে সাথে নিই। আমরা আমাদের অশ্বের শরীরের পার্শ্বে আমাদের পায়ের গোড়ালি দিয়ে আঘাত করি (দ্রুত চলার জন্য) এবং নদীর পাড়ের দিকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাই। আমার সাহসী লোকেরা নৌকাগুলোকে দেখতে পাবার পর তাদের কেউ কেউ ঘোড়াসহ নদীতে নেমে পড়ে এবং সাঁতরে নৌকাগুলোর দিকে এগিয়ে যায়। দ্রুতগতিতে গিয়ে তারা নৌকার উভয় পার্শ্বের দখল নিয়ে ফেলে এবং তাদেরকে আঘাত করে হটিয়ে দেয়ার হিন্দুদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়। শক্তিমত্তার সাথে তারা কিছু নৌকার উপর আপতিত হয়ে তরবারী দ্বারা কাকেরদেরকে খতম করে দেয় এবং তাদের লাশ নদীতে নিক্ষেপ করে। এভাবেই তাদেরকে পানির মধ্যদিয়ে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করে। আমার কিছুলোক ঘোড়া থেকে নেমে পাড় ধরে নদীর সরুধারার দিকে গিয়ে তীর বর্ষণ করে শত্রুর উপর হামলা চালায়। নৌকার আরোহীরাও পাল্টা তীর বর্ষণ করে, তবে এক পর্যায়ে তাদের নৌকাগুলো আমার সৈন্যরা ছিনিয়ে নেয় এবং সাজসরঞ্জামসহ তাদেরকে ধরে আমার সামনে নিয়ে আসে। শত্রুরা তাদের দশটি নৌকাকে শিকল ও শক্ত দড়ি দিয়ে একত্রে বেঁধে এনে সেসব থেকে যুদ্ধ চালাচ্ছিল। আমার লোকেরা তাদের অনেককে তীর বর্ষণে হত্যা করে, এরপর সাঁতরে নৌকায় উঠে জ্যান্ত যা কিছু পেয়েছে তরবারীর সাহায্যে খতম করে পানির মধ্যদিয়ে তাদেরকে জাহান্নামের আগুনে পাঠিয়ে দেয়।

নৌকার এই ঘটনার পর আমি যখন অবকাশ পেলাম, তখন আমি সেই একই দিন তুঘলকপুরের দিকে যাত্রা করি এবং সেখানে গিয়ে শিবির স্থাপন করি। আমি আমীর আল্লাহদাদ, বায়েজিদ কুচিন ও আলতুন বক্শীকে একটি বাহিনীসহ

অগ্রবর্তী দল হিসাবে প্রেরণ করি, যাতে তারা নদী পাড়ি দিয়ে শত্রুরা কোথায় আছে সে সম্পর্কে আমার জন্য খবর নিয়ে আসে। তাঁদের চলে যাবার পর রাতের তিন প্রহর যখন কেটে গেল, তখন দু'জন অশ্বারোহী এসে উপস্থিত হয়, তারা আল্লাহদাদের কাছ থেকে খবর নিয়ে আসে যে, সামরিক পর্যবেক্ষণকারী দল নদীর একটি সরুধারা খুঁজে পেয়েছে, যেখান দিয়ে তারা নদী পার হয়েছে এবং নদীর অপর পাড়ে কাফের হিন্দুদের একটি বিরাট দল দেখতে পেয়েছে, যারা মোবারক খান নামের এক ব্যক্তির অধীনে বিশাল পরিমাণ সম্পত্তি ও মালামাল নিয়ে অবস্থান করছে। এই সংখ্যক লোক নিয়ে তারা আস্থাশীল হয়ে যুদ্ধ করার জন্য তৈরী। এ খবর জানার সাথে সাথে আমি আমার সৈন্য সাজানোর আদেশ দেই এবং অশ্বে আরোহণ করে খুবই স্কুদ্ধ হয়ে রওনা হই। সকাল হবার আগেই আমি যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণভাবে সজ্জিত ১হাজার অশ্বারোহী নিয়ে গঙ্গা অতিক্রম করি। এক ত্রোশ অগ্রসর হবার পর ফজরের নামাজের সময় হয়, তাই একটি সমতল ভূমিতে অশ্ব থেকে নেমে নামাজ আদায় করি এবং আল্লাহর শোকর (প্রশংসা) করি। অতঃপর আমি সর্বশক্তিমানের আনুকূল্যের পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে আবারো অশ্বে উঠে শত্রুর দিকে যাত্রা করি। আমার অগ্রসরের খবর মোবারক খান পেয়ে ১০হাজার যোদ্ধাকে সারিবদ্ধ করে যুদ্ধের জন্য তৈরী হন।

একদিনে তিনটি বড় বড় বিজয়

আমার রক্ষীদলের প্রহরায় আমি সবধানতার সাথে শত্রুদলকে পরীক্ষা ও যাচাই-বাছাই করি। তখনো আমার ১হাজার অশ্বারোহীর সবাই সেখানে এসে সারেনি। সৈন্যবাহিনীর একটি বিরাট অংশ একটু দূরে একটি লুঠন অভিযানে ব্যাপ্ত ছিল। আমার ছিল কেবল ১হাজার লোক আর শত্রুদের সংখ্যা ছিল ১০হাজার, তথাপি আমি আল্লাহর উপর ভরসা রেখে তাঁর কাছে বিজয় প্রার্থনা করি। এক চমৎকার কাকতালীয় ব্যাপার ঘটলো, ঠিক এই সংকটক্ষেণে সাইয়্যিদ খাজা ও জাহান মালিক ৫হাজার অশ্বারোহীসহ সঠিক সময়ে দ্রুত গতিতে আমার পিছন দিকে এসে উপস্থিত হন, আমি তাঁদেরকে একটি লুঠন ভ্রমণে পাঠিয়েছিলাম। যদি এমনটা না ঘটতো, তাহলে হয়ত এখানেই সবার কাছ থেকে আমার শেষবিদায় নিতে হত, কারণ এখান থেকে পালানোটা ছিল খুবই কষ্টকর ব্যাপার। তাঁদের এই আগমনকে খুবই সৌভাগ্যসূচক হিসাবে গণ্য করে আমি আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করলাম এবং শত্রুদের মুখোমুখি হলাম। আমি আল্লাহদাদ ও আমীর শাহ মালিককে আমার প্রহরায় নিয়োজিত সহস্র অশ্বারোহী নিয়ে শত্রুদের উপর হামলা চালাবার নির্দেশ দেই এবং প্রতিপক্ষের সংখ্যা দেখে আতঙ্কিত না হতে বলি। যখন আমার নির্দেশের প্রতি আনুগত্যসরূপ তাঁরা সামনের দিকে প্রচণ্ড শক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো, শত্রু তখন আর হামলা চালানোর জন্য অপেক্ষা করলো না, বরং কাঁপতে কাঁপতে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালিয়ে গেল। আমার সাহসী সঙ্গীরা ধাওয়া করে তাদের অনেককে মেরে ফেললো। তাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে বন্দী, তাদের সম্পত্তি ও মালামাল লুঠন এবং প্রচুর সংখ্যক গরু ও মহিষ হস্তগত করলো। আল্লাহর রহমতে আমি এই বিজয় অর্জন করার পর অশ্ব থেকে নেমে আল্লাহর প্রশংসা জানানোর জন্য মাটির উপর সেজদাবনত হলাম। সৈন্যরা যখন পরিত্যক্ত মালামাল সংগ্রহে ব্যস্ত তখন আমি একটু জিরিয়ে নেবার জন্য বসে পড়ি। এ সময় অগ্রবর্তী সামরিক পর্যবেক্ষণ দলের কয়েকজন এই সংবাদ নিয়ে আসে যে, গঙ্গার পাড়ে কুটিলা^{৩৮} উপত্যকায় বিশাল সংখ্যক হিন্দু সমবেত হয়ে সেই উপত্যকাকে আশ্রয়ের উপযুক্ত স্থানে পরিণত করেছে। আমি সাথে সাথে অশ্বে উঠে পড়ি, আমার সৈন্যদের বিশাল অংশকে পরিত্যক্ত মালামাল সংগ্রহের কাজে রেখে মাত্র

৫শত অশ্বারোহী সাথে নিয়ে কুটিলা উপত্যকার দিকে যাত্রা করি। সেই স্থানে পৌঁছে আমি দাররাতে বিপুল সংখ্যক গেবরকে সমবেত দেখতে পাই। আমি সাথে সাথে আমীর শাহ মলিক ও আলী সুলতান তাওয়াচিকে হুকুম দেই, তাঁরা যেন শত্রুদের সংখ্যাকে তোয়াক্কা না করে হামলা চালান। বলে দিলাম যে, তাঁদের সামনে কুড়িজন পড়লো, না একজন পড়লো সেটাও দেখার দরকার নেই। অশ্ব চালিয়ে, রণশোর তুলে ও তরবারী উত্তোলন করে তাঁরা ভেড়ার পালের উপর ক্ষুধার্ত সিংহের মত শত্রুদের সেই বাহিনীর উপর আপতিত হন। প্রথম আঘাতেই শত্রুদের সারি ভেঙ্গে যায় এবং তাদের অনেক পুরুষ উত্তোলিত তরবারীর নিচে পতিত হয়। বিশাল সংখ্যক শত্রুর উপরে এধরনের একটি ছোটখাটো অনুসারী দল নিয়েও আল্লাহ আমাকে অতঃপর বিজয় দান করলেন।

তাদের অনেককে হত্যার পর যারা পালিয়ে গিয়েছিল তারা বনে-জঙ্গলে ও সংকীর্ণ গিরিসংকটে খেঁকশিয়াল ও শিয়ালের মত পালিয়ে বেড়াতে থাকে। তারা প্রচুর পরিমাণ মালামাল ফেলে গিয়েছিল এবং আমার সাহসী সৈন্যরা সেসব পরিত্যক্ত মাল সংগ্রহের কাজে লেগে পড়ে। কেবলমাত্র ১শত জন লোক রক্ষী হিসাবে আমার সাথে রইলো, অন্য ৪শত লোক ছিল সেই লুণ্ঠনকৃত মালামাল সংগ্রহে ব্যস্ত। এই সংকটমুহুর্তে কাফেরদের অধিনায়ক মালিক শাইখা ৫শত অশ্বারোহী ও বিশাল সংখ্যক পদাতিকের একটি বাহিনী নিয়ে আমার বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়। এই বাহিনী আমাকে হামলা করার জন্য এগিয়ে আসছে এটা আমি অনুধাবন করার পর আমার মধ্যে যুদ্ধের চেতনা জেগে উঠে, অতঃপর যে ১শত লোক আমাকে সহায়তা করছিল তাদেরকে নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য সবেগে সামনের দিকে এগিয়ে যাই। যখন আমাদের মাঝে কেবল এক তীরের সমপরিমাণ দূরত্ব রয়েছে তখন আমার অগ্রবর্তীদের একজন অশ্বারোহী ঘুরে আমার কাছে এসে জানায় যে, ওটা হচ্ছে আমার একজন পোষ্য ও সেবক শেখ কুকারের অধীনস্থ বাহিনী, তারা আমার সাথে যোগ দিতে আসছে। কথাটি আমার কাছে সত্য বলে মনে হয়েছিল এবং আমি সন্তোষচিত্তে পিছন ফিরে চলি। কিন্তু মালিক শাইখা তার তরবারী উত্তোলন করে এবং আমার অনুসারীদের বিরুদ্ধে তার লোকদের সাথে নিয়ে সাহসিকতার সাথে হামলা চালায়, এতে আমার বহু সংখ্যক সৈন্য আহত হয়। যখন আমি ব্যাপরটা নির্ণয় করতে পারলাম যে, এরা শত্রু, শেখ কুকারের লোক নয়, তখন আমি অশ্বের লাগাম ঘুরিয়ে দিই এবং শত্রুর উপর হামলা চালিয়ে তাদের অনেককে প্রথম আঘাতেই পরপারে পাঠিয়ে দিই। মালিক শাইখা পেটে বর্ষার আঘাত পেয়েছিল এবং তার মাথা তরবারীর আঘাতে কেটে গিয়েছিল। সে তার অশ্ব থেকে পড়ে গেলে আমার লোকেরা তাকে বন্দী করে। তারা তার দুই হাত তার গলার সাথে বেঁধে আমার সামনে নিয়ে আসে। অনেক গেবরকে হত্যা ও আহত করা হয়, হাতে গোনা কিছু সংখ্যক গেবর অর্ধমৃত

অবস্থায় (ভয়ের চোটে) পালিয়ে যায়। মালিক শাইখা বিশাল দেহী ও শক্তিশালী মানুষ, তাকে আহত অবস্থায়ই আমার সামনে আনা হয়। আমার উপস্থিতির ভয় তার ক্ষতের বেদনা আরো বাড়িয়ে দেয়, এটা তার উপর এমন প্রভাব ফেলে যে, আমি তাকে একটি প্রশ্ন করেছিলাম, সেটির জবাব দেবার আগেই সে তার প্রাণ জাহান্নামের প্রভুর কাছে সমর্পণ করে দেয়। আল্লাহ অতঃপর আমাকে এক দিনেই দুইটি বড় বিজয় দান করলেন এবং আমি তাঁর রহমতের শোকরিয়া আদায় করলাম।

আমি পুনরায় অশ্বে আরোহণ করি এবং তখনই আমার কাছে খবর আনা হয় যে, দুইক্রোশ দূরে কুটিলার দাররা উপত্যকায় এক বিশাল সংখ্যক কাফের ও গেবর তাদের স্ত্রী, সন্তান, বেষ্টমার সম্পত্তি, মালামাল ও গবাদিপশু নিয়ে সমবেত হয়েছে। সেখানে যাবার রাস্তা দুর্গম, জঙ্গল ও ঝোপ-ঝাড়ের মধ্য দিয়ে। একথা শোনার পর প্রথমেই আমার মাথায় এলো যে, আমি মধ্যরাত থেকে জেগে আছি, কোথাও না থেমে আমি বহুদূরের পথ পাড়ি দিয়েছি, অনেক বাধা অতিক্রম করেছি, আমি মাত্র কিছু সাহসী সৈন্য নিয়ে চমৎকার দুইটি বিজয় অর্জন করেছি এবং আমি খুবই ক্লান্ত, তাই আমার থামা ও বিশ্রাম নেয়া দরকার। কিন্তু তখন আমি স্মরণ করলাম, আমি তরবারী উত্তোলন করেছি ও হিন্দে এসেছি এর কাফেরদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে, তাই যতক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলিয়ে যাওয়া সম্ভব, ততক্ষণ বিশ্রাম নেয়া আমার জন্য হারাম। যদিও সে মুহূর্তে আমার সাথে খুব অল্প সংখ্যক সৈন্যই রয়েছে, তথাপি আমি আল্লাহর উপর ভরসা করে শত্রুদেরকে হামলা করার স্থিরসিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি। অশ্বকে চালিয়ে আমি যাত্রা শুরু করি এবং কিছুটা পথ যাবার পর আমার মনে পড়লো—আমি তিনদিন আগে শাহজাদা পীর মোহাম্মদ ও আমীর সুলায়মান শাহকে পিরোজপুর গ্রাম থেকে নদীর ওপাড়ে পাঠিয়েছি এবং আমি ভাবলাম, যদি তাঁরা এখন এসে আমার সাথে যোগ দিতেন তাহলে তা কত সৌভাগ্যের ব্যাপারই না হত! কিন্তু তখন আমি বললাম (নিজের মনে মনে), তাঁরা কি করে জানবেন যে, আমি নদী পাড়ি দিয়েছি বা তাঁরা কি করে অনুধাবন করবেন যে, আমি এই দূরের স্থানে কাফেরদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছি। আমি মাথা নিচের দিকে ঝুকিয়ে এইসব ভাবতে ভাবতে যাচ্ছিলাম, তখন হঠাৎ করে কিছুটা দূরত্বে লোকদের একটি বিশাল দল নজরে আসে এবং সেই দলের প্রত্যেক লোকই যেন তাদের ব্যাপারে কিছু একটা আমাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাইছে। আমি অনুসন্ধানীদলের কিছু লোককে ওটা কিসের বাহিনী নির্ণয় করার জন্য সামনে পাঠিয়ে দেই। তারা কাছে গিয়ে আবিষ্কার করে যে, ওটা পীর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর ও আমীর সুলায়মান শাহের বাহিনী। অনুসন্ধানীদলের লোকেরা তখনই শাহজাদার দিকে এগিয়ে গিয়ে তাঁকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানায়, কিভাবে আমি ইতিমধ্যে এক দিনেই দুইটি বড় বিজয় অর্জন করেছি এবং তৃতীয় দফায় এখন আমি কুটিলায় জড়ো হওয়া গেবরদের এক

বিশাল দলের বিরুদ্ধে অগ্রসর হচ্ছি। শাহজাদা ও তাঁর লোকেরা এর আগে আমার এসব অভিযান সম্পর্কে কিছু শোনেননি, যথাসময়ে এই খবর পেয়ে তাঁরা খুবই খুশী হন এবং আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য আসতে থাকেন। পর্যবেক্ষণের জন্য আমি যেসব অনুসন্ধানী চরকে পাঠিয়েছিলাম তারা ফিরে আসে এবং আমাকে জানায় যে, শাহজাদা তাঁর সামরিক কেতায় শ্রেণীবদ্ধ বাহিনী নিয়ে আসছেন। তারা আরো বলে যে, আমার হাতে ইতিমধ্যে যেসব দুঃসাহসী কর্মের ফল জমা হয়েছে সেসব সম্পর্কে তারা (দূতরা) জানানোর পূর্ব পর্যন্ত শাহজাদা সেসব সম্পর্কে কিছুই জানতেন না এবং এখন তিনি আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য আসছেন। আমি মনে মনে যা ভাবছিলাম সে অনুযায়ী এই খবরটি আসায় আমার খুবই আনন্দ হল। এটা আমার ধারণারও বাইরে ছিল, শাহজাদা যে নিকটেই রয়েছেন সে সম্পর্কে আমার কোন ধারণাই ছিল না, তাই আমি খুব খুশী এবং আমার অন্তর যা আশা করেছে তা আমার জন্য মঞ্জুর করায় আমি মাটিতে নেমে সেজদাবনত হয়ে আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করি। এই সময় আছর (বৈকালিক) নামাজের সময় হয়েছিল এবং এটা ছিল সেই মাসের ৪ তারিখ। শাহজাদা এবং আমীর সুলায়মান শাহ তাঁদের বিশাল বাহিনী নিয়ে এসে পড়েন এবং আমার সাথে সাক্ষাতের মাধ্যমে সম্মানিত হন। আমি দ্রুতগতিতে জঙ্গল ও ঝোপ-ঝাড় অতিক্রম করে কাফেরদের সামনে উপস্থিত হই। সামান্য প্রতিরোধ গড়ার পর শত্রুরা পালাতে শুরু করে, তবে তাদের অনেকেই আমার সৈন্যদের তরবারীর নিচে পতিত হয়। কাফেরদের সমস্ত স্ত্রী ও সন্তানদেরকে বন্দী করা হয় এবং তাদের বেস্তমার সম্পত্তি, মালামাল, স্বর্ণ, টাকাকড়ি, শস্য, অশ্ব, উট, গরু ও গবাদিপশু পরিত্যক্ত হয়ে আমার সৈন্যদের হাতে পড়ে। শত্রুদেরকে উৎখাত করে সস্তুষ্ট হয়ে আমি সেই মরুভূমিতে লোকজন নিয়ে আছরের নামাজ আদায় করে আল্লাহর কাছে শোকরিয়া জানাই এই জন্য যে, আমি তিনটি যুদ্ধ লড়লাম, যেখানে শত্রু সংখ্যা ছিল আমার একজনের বিপরীতে তারা দশজন বা বিশজন এবং প্রত্যেক যুদ্ধে আমি স্মরণীয় বিজয় অর্জন করেছি।

দিবাবসান হয়ে রাত্রি নেমে আসে কিন্তু সেই মরুভূমিতে শিবির স্থাপন করার মত উপযুক্ত কোন স্থান ছিল না, তাই আমি প্রচুর পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নিয়ে পিছনে ফিরে চলি এবং যেখানে আমি দ্বিতীয় বিজয় অর্জন করেছিলাম সেই ময়দানে এসে শিবির স্থাপন করি। সেখানে ঘুমিয়ে রাতটা কাটিয়ে দেই।

এই স্থানে আমার কাছে খবর আনা হয় যে, ১৫ ক্রোশ দূরে নদীর উজানে এবং পাহাড়ের কাছে একটি স্থানে পাথরে খোদাই করা একটি গরুর মূর্তি রয়েছে যার মুখ থেকে নদীটি প্রবাহিত হচ্ছে। হিন্দুস্তানের লোকদের বিশ্বাস হচ্ছে, এই পাহাড় থেকেই গঙ্গা নদীর উৎপত্তি হয়েছে। হিন্দু কাফেররা গঙ্গা নদীর পূজা করে এবং প্রতিবছর একবার এই স্থানে^{৩০} তীর্থ করার জন্য আসে, এই স্থানটাকে তারা

নদীটির উৎপত্তিস্থল বলে মনে করে, এখানে এসে তারান করে এবং তাদের চুল ও দাড়ি কামায়। তারা বিশ্বাস করে এই কাজটার মাধ্যমে তারা মুক্তি (পরকালীন) পাবে ও ভবিষ্যতের জন্য পূণ্য অর্জন করতে পারবে। যারা সুতিবস্ত্র পরিহিত ব্রাহ্মণ তাদের জন্য তারা দান হিসাবে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে এবং নদীতে তারা মূদ্রা (টাকা অর্থে) নিক্ষেপ করে। কাফেররা যখন দূরে কোথাও মারা যায় তখন তাদের মৃতদেহ পুড়িয়ে তার ছাইভস্ম এই নদীতে এনে নিক্ষেপ করা হয়। এটাকে তারা পবিত্রকরণ হিসাবে দেখে থাকে। এসব জানার পর আমি এই স্থানের কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি—যাতে আমি তাদেরকে উৎখাতের পুরস্কার (আব্রাহর কাছ থেকে) লাভ করতে পারি।

আমার কাছে আরো খবর আনা হল যে, আমি এখানে আসার আগে কুটিলা উপত্যকায় যাদেরকে পরাজিত করেছিলাম তাদের সমস্ত পুরুষকে হত্যা করে ফেলা যায়নি। সেদিন দিবাবসান প্রায় আসন্ন হয়ে পড়ায় অনেকে পালিয়ে যেতে পেরেছিল এবং অনেকে ঝোপ-জঙ্গল ও এবড়ো-থেবড়ো ভূমিতে লুকিয়ে গিয়েছিল। তাদের সমস্ত সম্পত্তিও লুণ্ঠন করা যায়নি। অতঃপর আমি পরদিন আবারো সেই উপত্যকায় গিয়ে বেঁচে যাওয়া সমস্ত কাফেরকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। এই জমাদিউল আউয়াল ভোরে আমি ফজরের নামাজ আদায় করে একটি উপযুক্ত বাহিনীসহ সেই উপত্যকার দিকে রওনা হই, উপত্যকাটি ছিল একটি সুউচ্চ পর্বতের পাদদেশে এবং গঙ্গা নদীর কিনারে। বিভিন্নস্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গেবররা রাতের বেলা তাদের প্রধানের অধীনে পুনঃসমবেত হয় এবং যেহেতু আরো নিরাপদ হবার মত কোন স্থান তাদের ছিল না, তাই তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে, মুসলমানরা যদি ফিরে আসে তারা মৃত্যু পর্যন্ত লড়াই করে যাবে। অতঃপর তারা যুদ্ধের জন্য তৈরী হয়। আমি দাররা'র কাছাকাছি পৌঁছার পর কাফেরদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে জয়ের জন্য আমার সৈন্যবাহিনীকে নিষ্ঠে উল্লেখিত ধরনে সাজাই। আমি আমার ডানপার্শ্বে রাখি পীর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর ও আমীর সুলায়মান শাহের বাহিনীকে। বামপার্শ্বের দায়িত্ব আমি তুমানদের বহু আমীরের উপর অর্পণ করি। আমি অগ্রবর্তীদলের নেতৃত্ব দেই আমীর শাহ মালিকের উপরে এবং আমি নিজে মধ্যখানের সৈন্যদের নেতৃত্ব নিজের হাতে রাখি। কাফেররা উপত্যকায় প্রবেশের পর তাদের সৈন্য সাজিয়ে সাহসের সাথে নিজেদের প্রকাশ করে আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে আসে প্রথমে। আমার সাহসী অগ্রবর্তী রক্ষীদল, ডান ও বামদলকে আমি সংযত করি এবং সবাইকে একত্রে সমবেত করি, এরপর পাহাড় ও উপত্যকায় প্রতিধ্বনি সহকারে সজোরে রণশোর তুলে শত্রুর উপর হামলা চালাই। যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের দামামা ও অন্যান্য রণবাদ্যের উচ্চশব্দ শোনা যায়, প্রথম ও দ্বিতীয় হামলায় শত্রুর উপর ভয়বিহ্বলতা ভর করে এবং তারা পালাতে থাকে। আমার সাহসী লোকেরা ব্যাপক উদ্যম ও সাহস প্রদর্শন করে,

তারা তাদের তরবারীকে তাদের পতাকায় পরিণত করে এবং শত্রুদের খতম করে দেবার কাজে নিয়োজিত হয়। অনেক কাফেরকে তারা হত্যা করে এবং যারা পার্বত্যঞ্চলের দিকে পালিয়ে গিয়েছিল তাদেরকে ধাওয়া করে। অতঃপর তাদের অনেকেই এমনভাবে নিহত হয় যে, পাহাড় ও সমতল সর্বত্র তাদের রক্তে সয়লাব হয়ে যায় এবং এভাবে তাদের প্রায় সবাই জাহান্নামে চলে যায়। পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় খুব কম সংখ্যক ব্যক্তি, তবে তারাও ছিল জখমপ্রাপ্ত, অবসন্ন ও অর্ধমৃত। তারা পাহাড়ের গুহার মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নেয়। তাদের অগুণ্টি সম্পদ ও মালামাল এবং বেগুমার গরু ও মহিষ পরিত্যক্ত হয়ে আমার বিজয়ী সৈন্যদের হাতে পড়ে।

কাফেরদের বিরুদ্ধে আমার কৃত এই ধ্বংসযজ্ঞের দ্বারা আমি যখন সন্তুষ্ট এবং এই ভূমি যখন তাদের অবস্থানের কলুষতা থেকে মুক্ত, তখন আমি বিজয় বশে ও সফলতার সাথে ফিরে চলি, সাথে থাকলো যুদ্ধলব্ধ সম্পদ। সেই দিনই আমি গঙ্গা পাড়ি দেই এবং সেই নদীর তীরে জামাতের সাথে যোহরের নামাজ আদায় করি। আমি আল্লাহর কাছে বিনয়ের সাথে শোকরিয়া আদায় করি এবং এরপর আবাবো অশ্বে আরোহণ করে নদীর নিচের দিকে ৫মাইল অতিক্রম করে শিবির স্থাপন করি। এই সময় আমার মনের মধ্যে জাগরিত হল যে, সিন্ধু নদী থেকে হিন্দুস্থানের রাজার রাজধানী দিল্লী পর্যন্ত আমি বিজয়ীর বশে পথ চলেছি। আমি পথের দু'ধারের কাফেরদেরকে তরবারী দ্বারা খতম করে দিয়েছি এবং এই ভূখণ্ডকে সাফ করেছি। আমি হিন্দুস্থানের রাজার সিংহাসন দখল করেছি, আমি দিল্লীর বাদশাহ সুলতান মাহমুদকে পরাজিত করেছি এবং তার বিরুদ্ধে সফলতা লাভ করেছি। আমি গঙ্গা ও যমুনা নদী অতিক্রম করেছি এবং আমি ঘৃণ্য কাফেরদের অনেককে জাহান্নামে পাঠিয়ে তাদের অপবিত্র অবস্থান থেকে এই ভূমিকে পবিত্র করেছি। আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করি এ জন্য যে, আমি যে কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলাম সে কাজ সম্পন্ন করতে পেরেছি এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে সেই পবিত্র যুদ্ধ চালাতে পেরেছি, যে যুদ্ধ চালাতে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।

অতঃপর আমি আমার রাজধানী ও স্বর্গ সমরখন্দের দিকে আমার গতি ঘুরিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। মাসের ৬ তারিখ আমি অশ্বে আরোহণ করি এবং যেখানে আমাদের ভারী মালপত্র রেখে এসেছিলাম, সেদিকে রওনা দেই। বহুদ্রোশ পথ পাড়ি দিয়ে আমি শিবির স্থাপন করি এবং সৈন্যদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করবার কিছু কর্মচারীকে সেখানে গিয়ে মালপত্রগুলো নিয়ে আসবার জন্য পাঠাই।

সিওয়ালিক পার্বত্যাঞ্চলে বিজয়

মঙ্গলবার আমি ৬ ক্রোশ পথ চলি এবং আমার ভারী মালপত্রগুলো তখন আর ৪ ক্রোশ দূরে। আমি এই সময় জানতে পারি যে, প্রচুর সংখ্যক কাফের সিওয়ালিক পার্বত্যাঞ্চলে সমবেত হয়েছে। এইসব পর্বত সম্পর্কে খোঁজ-খবর করায় আমাকে জানানো হল যে, হিন্দুস্তানের লোকদের গণনায় এখানে এক লাখের বেশী পর্বত রয়েছে। এখানে রয়েছে সংকীর্ণ ও শক্তিশালী উপত্যকা, যেসবে কাফেররা সমবেত হয়েছে। এই খবর পাবার সাথে সাথে আমি সৈন্যদেরকে মালপত্র নিয়ে সিওয়ালিক পার্বত্যাঞ্চলের দিকে রওনা দিতে নির্দেশ দেই এবং আমি নিজেও সেইদিকে অগ্রসর হই। সন্ধ্যা ও রাতে পথ চলে আমি ৫ ক্রোশ অতিক্রম করি এবং পার্বত্য এলাকায় তাঁবু ফেলি। এখানে এই বিরতিকালে শাহজাদা খলিল সুলতান ও আমীর শেখ নুরুদ্দিন— যারা মালপত্রের সাথে ছিলেন এবং যাদেরকে আমি নির্দেশ জারি করেছিলাম— তাঁরা এসে পড়েন। আমি যখন রাজকীয় তাকিয়াতে (কুশন) বসে ছিলাম— সকল শাহজাদা ও আমীর আমার চারপাশে অবস্থান করছিলেন, তখন আমীর সুলায়মান শাহ, আমীর শাহ মালিক, আমীর শেখ নুরুদ্দিন ও অন্যান্য আমীর তাঁদের স্থান থেকে দাঁড়িয়ে যান এবং সামনে এগিয়ে এসে আমার সামনে কুর্নিশ করে বলেন, “আমরা আপনার সেবক হিসাবে যতদিন আছি, আমাদের হাত ও পা যতদিন সচল আছে, আমরা আপনার আদেশ মান্য করে যাবো, কিন্তু সমস্ত কঠোর পরিশ্রম ও কষ্ট আমাদের মহান আমীর আপনার নিজের কাঁধে তুলে নেবার কি দরকার পড়েছে? সিওয়ালিকের কাফেরদের বিরুদ্ধে এগিয়ে গিয়ে তাদেরকে উৎখাত ও ধ্বংস করে দিতে আপনি আমাদেরকে হুকুম করুন।” জবাবে আমি বলি, “হিন্দুস্তানে আমার আসা এবং এইসব পরিশ্রম ও কষ্টের মধ্যদিয়ে যাওয়ার পেছনে প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে দুইটি কাজ সম্পন্ন করা। প্রথমটি হচ্ছে, মুসলমানদের ধর্মের শত্রু কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং এই ধর্মীয় যুদ্ধের মাধ্যমে পরজীবনের জন্য কিছু পুণ্য সঞ্চয় করা। অন্যটি হল দুনিয়াবী উদ্দেশ্য। সেটি হল, ইসলামের এই সৈন্যবাহিনী কাফেরদের সম্পদ ও মূল্যবান জিনিসপত্র লুণ্ঠন করে কিছু অর্জন করুক। যে মুসলমান তার

ধর্মের জন্য লড়াই করে লুষ্ঠন তার জন্য মায়ের দুধের মতই হালাল (আইনসঙ্গত) এবং হালাল সবকিছুই আল্লাহর রহমতস্বরূপ।” এই জবাব পেয়ে আমীররা নিশ্চুপ হয়ে যান।

এক সপ্তাহ পূর্বে জুমনা দুর্গ ও শহর লুষ্ঠন করতে, যে আমীর জাহান শাহকে আমি পাঠিয়েছিলাম তাঁকে এই সময় দ্রুত ফিরে এসে আমার সাথে পুনঃযোগ দেবার জন্য খবর দিয়ে কিছু দ্রুতগামী অশ্বারোহীকে পাঠিয়ে দেই, যাতে তিনি এবং তাঁর লোকজন এসে কাকেরদের সাথে লড়াইয়ের কৃতিত্বে শরীক হতে পারেন। সেই আমীর সরাসরি চলে এসে আমার সাথে যোগ দেন। তখন আল্লাহর উপর ভরসা করে আমি আমার যুদ্ধের অশ্বে আরোহণ করি এবং মাসের ১০তারিখ সিওয়ালিক পার্বত্যাঞ্চলের দিকে যাত্রা করি।

এইসব পাহাড়ের মাঝে বাহরুজ নামে একজন রাই ছিলেন। তাঁর বাহিনীর সংখ্যা, আড়ম্বরপূর্ণ, এবড়ো-খেবড়ো, সংকীর্ণ পথ ও শক্তিশালী অবস্থান তাঁকে পার্বত্যাঞ্চলের সমস্ত প্রধানদের মধ্যে এবং বাস্তবিকপক্ষে হিন্দুস্তানের বেশীরভাগ প্রধানের মধ্যে সর্বসর্বা করে তুলেছিল। বিশেষকরে এই সময়ে তিনি আমার আগমনের সংবাদ পেয়ে তাঁর অবস্থানকে যথাসম্ভব শক্তিশালী করে তোলেন এবং দেশটির সাংঘাতিক ধরনের সমস্ত রাই তাঁর চারপাশে সমবেত হন। লোকবল ও সৈন্যসংখ্যা, তাঁর উপত্যকার উচ্চতা ও সুরক্ষিত অবস্থানস্থল নিয়ে গর্বিত হয়ে তিনি শক্তপোক্ত হয়ে দাঁড়ান এবং যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন। অপরদিকে আমিও বাহরুজের উপর হামলা চালিয়ে সিওয়ালিক পার্বত্যাঞ্চল জয় করে নেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।

সিওয়ালিক বিজয়

১০ই জমাদিউল আউয়াল আমি আমার অশ্বে আরোহণ করি এবং আমার তরবারী উচিয়ে সিওয়ালিকের কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করার স্থিরসিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। প্রথমেই আমি আমার বাহিনীকে বিন্যস্ত করি। আমি ডানপার্শ্বের নেতৃত্ব প্রদান করি শাহজাদা পীর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর ও আমীর সুলায়মান শাহ'র উপর এবং বামপার্শ্বের নেতৃত্ব অর্পণ করি শাহজাদা সুলতান হোসেন ও আমীর জাহান শাহ'র অধীনে। মাঝখানের অগ্রবর্তীদের নেতৃত্ব শেখ নুরুদ্দিন ও আমীর শাহ মালিকের উপর অর্পণ করে তাঁদেরকে সামনে প্রেরণ করি। আমার সৈন্য বিন্যস্তকরণ সম্পন্ন হলে আমরা চলতে শুরু করি এবং উপত্যকার কাছাকাছি পৌঁছে গেলে ঢাক বাজানোর, বাদ্যযন্ত্রের শব্দ তোলার এবং রণশোর উচ্চকিত করার আদেশ দেই। যতক্ষণ পর্যন্ত পাহাড় ও উপত্যকায় এর ধ্বনি-প্রতিধ্বনি না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত শব্দ-বাদ্য চালিয়ে যেতে বলি। আমি উপত্যকার মুখ পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে অশ্ব থেকে নেমে আমীর ও সৈন্যদেরকে সামনে পাঠিয়ে দেই। তারা সবাই অশ্ব থেকে নেমে তাদের কোমর শক্ত করে বেঁধে পূর্ণ সংকল্প ও সাহসের সাথে সামনে যুদ্ধের দিকে এগিয়ে যান। শয়তানের মত হিন্দুরা লুকানোর জায়গাগুলোতে ওঁৎ পেতে ছিল। তারা আমার সৈন্যদের উপর হামলা চালায়, তবে আমার সৈন্যরা তীর বৃষ্টি বর্ষণ করে এবং তরবারী নিয়ে তাদের উপর চড়াও হয়ে উপত্যকার দিকে ঢুকে পড়ে। সেখানে তারা তাদের কাছাকাছি পৌঁছে যায় এবং খুবই সাহসের সাথে লড়াই করে তরবারী, ছুরি ও ছোরার সাহায্যে শত্রুদেরকে হত্যা করে। এতবেশী লোককে হত্যা করা হয় যে, রক্তের স্রোত বয়ে যায়। এ অবস্থা দেখে কাফের গেবররা ভীত-বিহ্বল হয়ে পালাতে থাকে। পবিত্র যোদ্ধারা তাদেরকে পিছু ধাওয়া করে এবং লাশের স্তূপ গড়ে তোলে। খুবই কম সংখ্যক হিন্দু দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত, জখমপ্রাপ্ত ও আধমরা অবস্থায় পালিয়ে গিয়ে গর্ত ও গুহার মধ্যে আত্মগোপন করে। টাকা (অর্থ), মালামাল ও দ্রব্যসামগ্রী, গরু ও গবাদিপশুসহ বেগুমার পরিত্যক্ত সম্পদ আমার সৈন্যদের হাতে পড়ে। উপত্যকার সকল হিন্দু নারী ও শিশুকে বন্দী করা হয়। সিওয়ালিকের এই সমস্ত উদ্ধৃত কাফেরের পরাজয়ে এবং যে বিজয় অর্জন করেছি তাতে আমি পূর্ণ সন্তুষ্ট হয়ে বিজয় উল্লাস সহকারে ফিরে আসি এবং সেই একইস্থানে শিবির স্থাপন করি। এই রাতটি আমি শাহজাদা পীর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীরের তাঁবুতে মেহমান হিসাবে কাটাই।

সকাল হলে আমি আমার লোকজনের হাতে পড়া লুণ্ঠিত মালামাল একত্রিত করার আদেশ দেই, যাতে কারা বেশী পেয়েছে এবং কারা কম পেয়েছে তা বুঝতে পারি। আমি সেগুলোকে সুষ্ঠুভাবে সবার মাঝে বন্টন করে দেই।^{৪১} সেইদিন মাসের ১১তারিখ আমি পথচলা শুরু করি এবং ভারী মালামাল বহনকারীদের সাথে যোগ দেই। মায়াপুর^{৪২} রাজ্যের বাহরাহ গ্রামে আমি শিবির স্থাপন করি। পরদিন আবার পথচলা শুরু করি এবং ৪ ক্রোশ চলা শেষ করে শিক্সার গ্রামে থামি। এখানে ভারী মালপত্রের সাথে বিপুল পরিমাণ লুণ্ঠিত মালামাল, জিনিসপত্র ও গবাদিপশু সংগৃহীত হয় এবং সৈন্যবাহিনীর লোকেরা ভারী মালপত্রের ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। একই কারণে দিনে ৪ বা ৫ ক্রোশের বেশী পথচলাও দুরূহ হয়ে ওঠে। মাসের ১৩ তারিখ আমি কান্দার গ্রামে শিবির স্থাপন করি।

পরদিন ১৪ই জমাদিউল আউয়াল আমি মালপত্র নিয়ে যমুনা নদী পাড়ি দিয়ে সিওয়ালিক পার্বত্যঞ্চলের অপর অংশে তাঁবু ফেলি। এখানে আমি জানতে পারি যে, সিওয়ালিকের এই অংশে রতন সেন নামে উচ্চ মর্যাদা ও শক্তি সম্পন্ন একজন রাজা রয়েছেন। তাঁর উপত্যকা আরো বেশী উচ্চ ও পথগুলো আরো বেশী সংকীর্ণ এবং তাঁর বাহিনী রাজা বাহরুজের চেয়ে অনেক অনেক বড়। তাঁর চারপাশের পাহাড়গুলো মাত্রাতিরিক্ত উচ্চ এবং জঙ্গল ও গাছগাছালি অস্বাভাবিক ঘন। তাই জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে কেটে কেটে যাওয়া ছাড়া সেখানে ঢোকা অসম্ভব। যখন রতন সেন সম্পর্কে আমি এইসব বিষয় বুঝতে পারলাম, আমি ধর্মের একজন যোদ্ধা হিসাবে আমার দায়িত্ব অনুভব করলাম এবং সেই রাতটা আরামে কাটিয়ে দিতে আমি নারাজ ছিলাম। তাই আমি আমীর ও অন্যান্য কর্মকর্তাদেরকে হাজির হতে ডেকে পাঠাই। তাঁরা সবাই এলে আমি তাঁদের লোকজনকে যুদ্ধের জন্য তৈরী করতে এবং জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে পথ তৈরী করার জন্য কুড়াল ও গাছ কাটার যন্ত্রপাতি সাথে নিতে নির্দেশ দেই। আমি কয়েক হাজার মশাল জ্বালাবার এবং স্থান ত্যাগ করার ঢাক বাজানোর জন্যও আদেশ প্রদান করি। অতঃপর রাতে আমি অশ্বে আরোহণ করি এবং জঙ্গলে পৌঁছার পর আমার যোদ্ধাদেরকে জঙ্গল কেটে তার মধ্যদিয়ে পথ করার নির্দেশ দেই। আমার আদেশ কার্যকর করার জন্য তারা এগিয়ে যায় এবং পুরো রাত জুড়ে তারা পথ তৈরী করার কাজে নিয়োজিত থাকে। আমি সামনে চলে যাই এবং ভোর হলে জঙ্গল কেটে তার মাঝখান দিয়ে যে পথ তৈরী করা হয়েছে সেখান দিয়ে ১২ ক্রোশ অতিক্রম করি। জঙ্গল থেকে যখন আমি বেরিয়ে আসি, তখন সকাল হচ্ছে। আমি আমার অশ্ব থেকে নেমে ফজরের নামাজ আদায় করি। এরপর আমি আবারো অশ্বে আরোহণ করি এবং ১৫ তারিখ সকালবেলা আমি দেখি আমার দুই দিকে দুইটি পাহাড়, আর আমি মাঝখানে। একটি হল সিওয়ালিক পাহাড় এবং অপরটি হল কুকা পাহাড়। এটা ছিল উপত্যকা এবং মাত্রাতিরিক্ত শক্তিশালী। দুই পাশের দুই পাহাড়ের মাথাই মেঘমালাকে ছুঁয়েছে। এই উপত্যকার সামনে রাজা রতন সেন তাঁর পিপিলিকা বা

পঙ্গপালের মত বিশাল সংখ্যার বাহিনী মোতায়ন করেছেন। সেখানে তিনি অবস্থান নিয়ে স্বাভাবিক নিয়মে বিন্যস্তকৃত একটি অগ্রবর্তীদল, একটি ডানপার্শ্ব ও একটি বামপার্শ্বের দল নিয়ে যুদ্ধের জন্য তৈরী হয়ে আছেন।

রাজা রতন সেনের বিন্যস্তকৃত সৈন্যদলের উপর আমার দৃষ্টি পড়ার সাথে সাথে আমি আমার যোদ্ধাদেরকে জোরে রণশোর তোলার এবং ঢাক ও অন্যান্য রণবাদ্য বাজানোর আদেশ দেই। এই শব্দ পাহাড়গুলোর মধ্যে এমন ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তোলে যে, কাফেরদের হৃদয়ে ভয়-ভীতি ঢুকে যায় এবং তারা কাঁপতে থাকে, অতঃপর তারা আত্ম হারিয়ে ফেলে। সেই মুহূর্তে আমি আমার বাহিনীকে কাফেরদের উপর একটি বড়ধরনের আক্রমণ চালানোর নির্দেশ প্রদান করি। প্রথম আঘাতেই হিন্দুরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে এবং পালাতে শুরু করে। আমার বিজয়ী সৈন্যরা তাদের পিছু ধাওয়া করে তরবারীর প্রচণ্ড আঘাতে পলায়নপরদের অনেককে হত্যা করে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেয়। কেবলমাত্র গুটি কতেক লোক পালিয়ে যায়। তারা জখমগ্রাণ্ড ও মনোবল হারা হয়ে শিয়ালের মত বনের মধ্যে গিয়ে আত্মগোপনের মাধ্যমে প্রাণ রক্ষা করে। তখন আমার সৈন্যরা হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করে বিপুল পরিমাণ মালামাল, মূল্যবান জিনিসপত্র, বন্দী ও গবাদিপশু লুটে নেয়। এমন কেউ ছিল না, যে একশত বা দুইশত গরু এবং দশ বা বারো জন দাস (যুদ্ধবন্দী) পায়নি, অন্যান্য লুণ্ঠিত মালামালও ছিল বেগুনার। এইদিন শাহজাদা পীর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর ও আমীর সুলায়মান শাহ ডান পার্শ্বের সৈন্যবাহিনী নিয়ে এবং শাহজাদা সুলতান হোসেন ও আমীর জাহান শাহ বামপার্শ্বের সৈন্যবাহিনী নিয়ে ফিরে আসেন এবং আমার সাথে যোগ দেন। আমার আদেশে তাঁরা আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উপত্যকায় আমার ডান ও বামপার্শ্বে ঢুকে পড়েছিলেন। তাঁরা কাফেরদের মোকাবেলা করেন এবং তাদের অনেককে উৎখাত করেন। তাঁরা তাদের বিশাল সংখ্যককে হত্যা করেন, তবে তাঁরা তেমন বেশী পরিত্যক্ত মালামাল পাননি। রতন সেন ও তাঁর বাহিনীর বিরুদ্ধে যে বিজয় আমি অর্জন করেছি এবং তাঁর যত সম্পদ ও মালামাল আমার সৈন্যদের হাতে পড়েছে তাতে আমি সন্তুষ্ট হই। দিবাবসান ঘনিয়ে আসে এবং আমি দুই পাহাড়ের মাঝখানে তাঁবু স্থাপন করি। যেসব ডান ও বাম পার্শ্বের শাহজাদা ও আমীরের পথ অন্য উপত্যকাগুলোর মধ্যদিয়ে ছিল তাঁরা সন্ধ্যায় আমার কাছে ফিরে আসেন, সেটা ছিল শুক্রবার, ১৬ তারিখ^{৪২}। তাঁরা শত্রুর সাথে কিভাবে লড়াই করেছেন তার ব্যাপারে আমার কাছে প্রতিবেদন পেশ করেন এবং যঁারা সাহসিকতা প্রদর্শন করে নিজেদেরকে বিশিষ্ট করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন তাঁদের কথা বলেন। একটা রাত বিশ্রাম নিয়ে শুক্রবার সকালে আমি জেগে উঠে নামাজ আদায়ের পর অশ্বে আরোহণ করে সিওয়ালিক পার্বত্যঞ্চল বিজয়ের দৃঢ়সংকল্প নিয়ে ঐ দুইটি পাহাড়ের উপত্যকার দিকে চলি।

নাগরকোট (কাজরা) দখল

আমি যখন সিওয়ালিকের দিক থেকে উপত্যকায় প্রবেশ করি তখন নাগরকোট শহর সম্পর্কে আমার কাছে খবর আনা হয়। এটি হিন্দুস্তানের একটি বিশাল ও গুরুত্বপূর্ণ শহর এবং এটি এইসব পর্বতমালার ভিতর অবস্থিত। এর দূরত্ব ৩০ ক্রেনশ, কিন্তু সেদিকে যাবার রাস্তাটি জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এবং উচ্চ ও এবড়ো-ধেবড়ো পাহাড়ের উপর দিয়ে। এইসব পাহাড়ের মধ্যে যেসব রাই ও রাজা রয়েছেন তাঁদের সবার অধীনেই বিশাল সংখ্যক লোকজন রয়েছে। নাগরকোট ও এর আশেপাশের দেশ সম্পর্কে আমি এইসব তথ্য জানার পর আমার পুরো মনটাই চাইছিল যে, আমি ঐস্থানের হিন্দু কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি এবং ভূখণ্ডটা দখল করি। অতঃপর আমি আমার অশ্বকে সেদিকে বেগে ছুটিয়ে গমন করি।

আগের দিন আমীর জাহান শাহ'র নেতৃত্বাধীন বামপার্শ্বের সৈন্যবাহিনী কোন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আহরণ করতে পারেনি, তাই আমি তাঁর সৈন্যদলকে কাফেরদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে সম্মুখ সারিতে থাকার নির্দেশ দেই, যাতে তাঁরা পরিত্যক্ত সম্পদ দখল করে আগের দিনের অভাব পুষিয়ে নিতে পারে। আমি অগ্রবর্তীদল হিসাবে সাইন তৈমুরকে একদল সৈন্যসহ অগ্রভাগে প্রেরণ করি এবং এরপর আমি তাদের অনুসরণ করি। সকালের নাস্তার সময়ে অগ্রবর্তীদলের অধিনায়ক সাইন তৈমুর আমার কাছে খবরসহ লোক পাঠিয়ে জানান যে, সামনে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত অবস্থায় কাফেরদের এক বিশাল বাহিনী রয়েছে। বামপার্শ্বের বাহিনীসহ সামনে প্রেরিত আমীর জাহান শাহকে এবং খোরাসানের সৈন্যবাহিনীকে আমি শত্রুদেরকে হামলা করার আদেশ দেই। আমার আদেশের আনুগত্য করে আমীর এগিয়ে গিয়ে শত্রুকে হামলা করেন। একেবারে প্রথম হামলাতেই কাফেররা পরাজিত হয়ে পালাতে শুরু করে। পবিত্র যোদ্ধারা তরবারী হাতে পলায়নপরদের উপর জোরে আঘাত হানে এবং লাশের স্তুপ গড়ে তোলে। বহু সংখ্যক লোককে হত্যা করা হয় এবং বিপুল পরিমাণ মালামাল ও মূল্যবান জিনিসপত্র, বেশভূষার বন্দী ও গবাদিপশুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বিজয়ীদের হাতে পড়ার পর তারা বিজয় উল্লাস ও পরিত্যক্ত সম্পদের বোঝা সহকারে ফিরে আসে।

আমীর শেখ নুরুদ্দিন ও আলী সুলতান তাওয়াচির সৈন্যবাহিনীর অধীন এক অশ্বারোহী দ্রুতগতিতে এসে আমাদের জানায় যে, আমার বামপার্শ্বে একটি উপত্যকায় প্রচুর সংখ্যক হিন্দু ও গেবর সমবেত হয়ে যুদ্ধের আয়োজ্য তুলেছে। তাদের চারপাশে চরে বেড়ানো গবাদিপশু ও মহিষের সংখ্যা এতবেশী যে, তা কল্পনারও বাইরে। একথা শোনার সাথে সাথে আমি সেই স্থানের দিকে এগিয়ে যেতে থাকি এবং পথের উপরে জামাতসহ যোহরের নামাজ আদায় করি। আমি শেখ নুরুদ্দিনের সাথে যোগ দেই এবং তাঁকে আলী সুলতান তাওয়াচিসহ সৈন্যে শত্রুর বিরুদ্ধে এগিয়ে যেতে নির্দেশ প্রদান করি। এই নির্দেশ মেনে তাঁরা সাহসিকতার সাথে সামনে এগিয়ে যান। দ্রুত পথ চলার পর কাফেররা তাঁদের দৃষ্টিসীমার মধ্যে চলে আসে। একপাল ক্ষুধার্ত ধারালো নখর বিশিষ্ট নেকড়ে বাঘের মত তাঁরা শিয়াল সদৃশ কাফেরদের পালের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং তাঁদের তরবারী ও অস্ত্রকে সেইসব দুরাত্মার রক্তে রঞ্জিত করতে থাকেন ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ না রক্তের স্রোত উপত্যকা বেয়ে নেমে আসে। আমি পিছন থেকে সামনে চলে গিয়ে দেখতে পাই সবদিকেই শত্রুরা বাতাসে উড়ছে এবং আমার সাহসী সৈন্যরা মাটির উপর শত্রুদের রক্ত ছিটোচ্ছে। হিন্দুদের একটি দল পাহাড়ের দিকে পালিয়ে যায়, আমি একদল সৈন্য নিয়ে তাদেরকে সেই উচ্চ পাহাড়ের উপর পর্যন্ত ধাওয়া করি এবং তরবারীর আঘাতে তাদেরকে খতম করে দেই। পাহাড়ের চূড়ায় উঠে আমি থামি। স্থানটিকে সবুজ ও মনোহর দেখতে পেয়ে আমি সেখানে বসে পড়ি এবং নিচে আমার লোকদের লড়াই ও দুঃসাহসিক কাজকর্মগুলো দেখতে থাকি। আমি স্বচক্ষে তাদের কর্মকাণ্ড, কিভাবে তারা কাফের হিন্দুদেরকে তরবারীর খোরাকে পরিণত করছে সব পর্যবেক্ষণ করি। সৈন্যরা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ এবং গবাদিপশু ও বন্দী সংগ্রহে লিপ্ত হয়। এই সব সংগ্রহ গণনার সমস্ত সীমা অতিক্রম করেছিল এবং তারা বিজয়ী হয়ে উল্লাস সহকারে ফিরে আসে। শাহজাদা ও আমীরগণ এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা আমার সাথে দেখা করতে এবং এই বিজয়ে আমাদের অভিনন্দন জানাতে পাহাড়ের উপর চলে আসেন।

আমি তাদের সাহসিকতাপূর্ণ চমৎকার কাজকর্মগুলো দেখেছি। আমি এই সময় সেইসব সাহসী লোকদের পদমর্যাদা বাড়িয়ে দেই এবং তাদেরকে রাজোচিত উপহারসামগ্রী দ্বারা ভূষিত করি। সংগ্রহ করে আনা বিপুল সংখ্যক গরু ও মহিষ সামনে আনা হয় এবং আমি নির্দেশ দেই যে, যারা একাই ঐসব জন্তু কয়েকটি করে ধরেছে তারা তা থেকে তাদেরকেও কয়েকটি করে প্রদান করুক, যারা একটিও ধরতে পারেনি। এই নির্দেশের মাধ্যমে ছোট ও বড়, শক্তিশালী ও দুর্বল প্রত্যেক লোক পরিত্যক্ত সেই সম্পত্তির ভাগ পেয়েছিল। আমি সন্ধ্যা পর্যন্ত সেই পাহাড়ে অবস্থান করি এবং মাগরিবের (সন্ধ্যার) নামাজ আদায় করার পর নেমে

আসি। উপত্যকার যেখানটায় ঝরণাধারা বইছিল সেইখানে আমি শিবির স্থাপন করি। এইসব পার্বত্যঞ্চলে আমি যতবারই শিবির ফেলেছি ততবারই জঙ্গল ও বন থেকে বিপুল সংখ্যক বানর দিনে ও রাতে শিবিরে এসে উপস্থিত হয়েছে এবং খাবার মত যা-ই পেয়েছে তাতে দাঁত বসিয়েছে এবং লোকজনের সামনে দিয়ে তা নিয়েও গেছে। রাতের বেলা এই বানরেরা লোকজনের বিশেষ ও দুর্লভ জিনিসপত্র চুরি করেছে।

১৪ই জমাদিউল আউয়াল থেকে আমি যখনই এই সিওয়ালিক পার্বত্যঞ্চলে প্রবেশ করেছি, বহুবার শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি, আমি বিজয় অর্জন করেছি এবং দুর্গ দখল করেছি। সেই সময় থেকে ১৭ই জমাদিউল আখির এই একমাস দুইদিন আমি জন্ম দুর্গে এসে পৌছা পর্যন্ত ঐসব পর্বতমালার হিন্দু দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, হত্যা ও লুণ্ঠনে লিপ্ত থেকেছি। আমি গণনা করে দেখেছি যে, ঐ বত্রিশ দিনে আমি শত্রুর বিরুদ্ধে ২০টি যুদ্ধ করেছি এবং বহু বিজয় অর্জন করেছি। আমি কাফেরদের অধীন ৭টি বিখ্যাত দুর্গ দখল করেছি, যেগুলো একটির চেয়ে অপরটি দুই বা তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত এবং এগুলো ছিল এই অঞ্চলের রত্ন ও সৌন্দর্য সদৃশ। এইসব দুর্গ ও দেশের জনগণ এর আগে হিন্দুস্তানের সুলতানকে জিজিয়া^{১০} দিত, কিন্তু দীর্ঘদিন অতিবাহিত হবার পর তারা শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং ঐসব সুলতানের প্রতি তারা আনুগত্য ত্যাগ করে, তারা আর জিজিয়া দিত না, বরং সব ধরনের বিরোধিতায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিল।

এইসব ৮টি দুর্গের মধ্যে ১টি দুর্গের প্রধানের নাম ছিল শাইখা, তিনি ছিলেন মালিক শাইখা কুকারের আত্মীয়। সেই দুর্গের লোকেরা তাদের সাথে বসবাসরত কিছু মুসলমানকে তাদের মধ্যস্থতাকারী হিসাবে পাঠিয়ে আত্মসমর্পণ করার ও আমার সেবায় নিয়োজিত হবার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু আমি সেই দুর্গের লোকদের চেহারা চাতুরী ও বিশ্বাসঘাতকতার ভাবভঙ্গী দেখতে পাই। আমার মন্ত্রীরা যখন মুক্তিপণের টাকার অংক ঠিক করে দেন এবং কর্মকর্তারা তা সংগ্রহের জন্য এগিয়ে যান, তখন এইসব বদ লোকেরা চালাকীর আশ্রয় নিয়ে নগদ অর্থ প্রদান থেকে বিরত থাকে। এটা শোনার পর আমি আদেশ দেই যে, নগদ টাকা এবং স্বর্ণ বা রৌপ্যমুদ্রার পরিবর্তে তাদের সব ধরনের জিনিসপত্র ভালো দাম ধরে গ্রহণ করা হোক। যখন তারা এটা বুঝতে পারলো যে, রেহাই পাবার পথ নেই, তখন তারা সব ধরনের জিনিসপত্র সামনে নিয়ে আসে এবং খুবই উচ্চ মূল্য ধরে সেসব দিয়ে দেয়। সুতরাং যা ঘটলো তা হল, তারা টাকার বদলে তাদের সমস্ত ধনুক, তীর ও তরবারী— যা কিছু তাদের মালিকানায় ছিল— সেসব কিছু তারা সমর্পণ করলো। এই সময় আমি এক আদেশ জারি যে, আমার কোষাধ্যক্ষ হিন্দু শাহকে সহায়তা করার জন্য দুর্গের (আত্মসমর্পণকারী) ৪০জন হিন্দু যেন আসে। অবাধ্য ও

বিদ্রোহী ভাবাপন্ন হয়ে তারা এতে বিরত থাকে এবং আমার আদেশের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করে। এমনকি দুর্গের মধ্যে অবস্থানরত কিছু মুসলমানকে (তেমুরের পক্ষের) তারা হত্যা করে। এসব শোনার পর আমি আমীরদেরকে তাঁদের স্ব স্ব বাহিনী নিয়ে দুর্গের বিরুদ্ধে সাহসের সাথে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দেই। আমার আদেশের বাস্তবায়নসরূপ আমার সমস্ত বাহিনী ঐস্থানে হামলা চালাতে তৈরী হয়ে যায়। তারা প্রত্যেক দিক থেকে দুর্গের উপর প্রচণ্ড হামলা চালায় এবং দেয়ালের সাথে মই লাগিয়ে দেয়ালে উঠে ভিতরে ঢুকে পড়ে। সেই সৈন্যনিবাসের লোকেরা তাদের কর্মের অপরাধে মৃত্যুর যোগ্য হয়ে পড়েছিল, তাদেরকে হত্যা করা হয়। দুই হাজার জনকে সেভাবে খতম করে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেয়া হয়। নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করা হয় এবং সেই দালানটিকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়। আল্লাহর রহমত ও দয়ায় সিওয়ালিকের এই সব দুষ্ট কাফেরদেরকে উৎখাত করতে পারায় আমার হৃদয় সন্তুষ্টিতে ভরে উঠে। আমি তাদের শক্তিশালী ঘাঁটিগুলো দমন করি। এরপর সেখানে জয় করার মত আর কোন রাই বা রাজা ছিল না। কাছে-ধারে কোথাও আর কোন কাফের আছে কিনা, যার বিরুদ্ধে আমি পবিত্র যুদ্ধের কশাখাত চালাতে পারি তা আমি এই অঞ্চলের সাথে পরিচিত লোকজনের কাছে খোঁজ-খবর করি।

জন্মু জয়

আমার খোঁজ-খবরের জবাবে আমাকে খবর দেয়া হয় যে, জন্মুর দুর্গ কাছেই, এটা সিওয়ালিক ও কুকা পার্বত্যাঞ্চলের সাথে সংযুক্ত এবং এর অধিবাসীরা হিন্দুস্তানের সুলতানের প্রতি বিনীত ও অনুগত নয়। এইসব তথ্য আমাকে জানানো হলে আমি ১৬ই জমাদিউল আখির ৮০২ হিজরী জন্মুর কাফেরদের বিরুদ্ধে আমার অস্ত্র ব্যবহারের স্থিরসংকল্প নিয়ে মানসার গ্রাম থেকে রওনা হই। ৬ ফ্রেঞ্চ পথ চলার পর আমি জন্মু ভূখণ্ডের বাইলা গ্রামে তাঁবু ফেলি। আমি আমীর আইকু তৈমুরের পুত্র আমীর শেখ মোহাম্মদ ও অন্য কিছু কর্মকর্তাকে একদল অশ্বারোহীর প্রধান নিযুক্ত করে বাইলা গ্রামের বিরুদ্ধে প্রেরণ করি। সেই গ্রামের লোকেরা তাদের সংখ্যা, জঙ্গলের ঘনত্ব এবং উচ্চস্থানে অবস্থানের কারণে আত্মশীল ছিল, তারা যুদ্ধ ও প্রতিরোধ করার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে জঙ্গলের সীমানার বিভিন্ন স্থানে গুঁপেতে থাকে। যে আমীররা অগ্রবর্তী হিসাবে গিয়েছিলেন তাঁরা আমাকে এই তথ্য জানিয়ে শত্রুকে হামলা ও পরাজিত করার অনুমতি চান। আমি জবাবে বলে পাঠাই, আমি নিজে এই পবিত্র যুদ্ধের কৃতিত্বে অংশ নিতে ইচ্ছুক, তাই আগামীকাল আমি না আসা পর্যন্ত যুদ্ধ বিলম্বিত করা হোক। আমার আদেশ তাঁদের কাছে পৌঁছলে তাঁরা সেদিনের মত অভিযান স্থগিত রাখেন। পরদিন ১৭ তারিখ, আমি বাইলার দিকে পথচলা শুরু করি। আমার রাজকীয় পতাকার উপর যখন শত্রুর দৃষ্টি পড়লো এবং আমার যোদ্ধাদের রণশোর তাদের কানে বাজলো, তারা কেঁপে উঠলো এবং পালিয়ে গিয়ে ঘন জঙ্গল ও ঝোপঝাড়ের মধ্যে আশ্রয় খুঁজলো। আমি সম্মুখসারির আমীরদেরকে এগিয়ে গিয়ে জঙ্গল ও বনের মুখ দখল করার নির্দেশ দেই, যাতে আমার সৈন্যরা বাইলা গ্রামে ঢুকে নিরাপদে লুণ্ঠন করতে পারে। বলে দিলাম, জঙ্গল ও বনের মধ্যে কোন লোক ঢুকার দরকার নেই। আমীররা এইসব নির্দেশ কার্যকর করেন এবং সৈন্যরা প্রচুর পরিমাণে শস্য, চিনি ও তেল সংগ্রহ করে। এরপর তারা বাড়ী-ঘরগুলোতে আগুন লাগায় এবং দালানগুলো ধ্বংস করে দেয়।

একইদিন আমি চার ত্রোশ অগ্রসর হয়ে তাঁর ফেলি। উলজা তৈমুর তুংকাতার, ফুলাদ বাহাদুর ও জৈনুদ্দিন- যাদেরকে আমি দিল্লী থেকে দূত হিসাবে কাশ্মীরের বাদশাহ শাহ ইস্কান্দারের কাছে পাঠিয়েছিলাম- তাঁরা এই সময় শাহএর একজন দূতকে একটি চিঠিসহ সাথে নিয়ে আমার কাছে ফিরে আসেন। আমি চিঠিটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ি। এটা খুবই সম্মানপূর্ণ ভাষায় লিখা, বাদশাহ নিজেকে আমার বিনীত সেবক হিসাবে ঘোষণা করে তাঁর এই পত্র অনুযায়ী চলার মনোভাব ব্যক্ত করেছেন এবং আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারলে সম্মানিত হবেন বলে জানিয়েছেন। শাহএর দূত নত হয়ে কুর্নিশ করার পর আমাকে জানান যে, তাদের মালিক আমার সাথে দেখা করার জন্য জাহান গ্রাম পর্যন্ত এসেছেন।

কাশ্মীরের বাদশাহ ইস্কান্দার

এই সময় আমাকে খবর দেয়া হয় যে, শাহ ইস্কান্দারের দূত মোল্লা নুরুদ্দিন- যিনি আমার সামনে এসেছিলেন- অনুমতি ছাড়াই জাভান^{৪৪} গ্রামে তার মালিকের কাছে ফিরে গিয়েছিলেন, একথাটা বলার জন্য যে, আমার অর্থমন্ত্রী কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, তিনি (ইস্কান্দার) যখন আমার দরবারে আসবেন, তখন তাঁর কাছ থেকে ৩০ হাজার অশ্ব এবং ১লাখ রৌপ্যের টংকা- প্রতিটি টংকা হবে ওজনে আড়াই মিসকাল সমপরিমাণ- কর হিসাবে দাবী করা হবে। এ খবর শুনে এটা পরিশোধের ব্যবস্থা করার জন্য শাহ ইস্কান্দার জাভান থেকে কাশ্মীর ফিরে যান। একথা জানতে পেরে আমি আমার অর্থ দপ্তরের কর্মকর্তাদেরকে ডেকে এনে বলি যে, তারা শাহ ইস্কান্দারের কাঁধের উপর খুবই ভারী একটি বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন, প্রত্যেক দেশের কাছ থেকে সেই দেশের আয় ও চাষাবাদের উপর ভিত্তি করে সেই অনুপাতে কর ও রাজস্ব দাবী করা উচিত এবং তারা শাহ ইস্কান্দারের কাছে এ ধরনের একটি দাবী তুলে দিয়ে তাদের অজ্ঞতা প্রদর্শন করেছেন। আমি তৎক্ষণাৎ শাহের দূতকে একটি লম্বা টিলা পোশাক ও উপহার পাঠিয়ে পুনরায় আশ্বস্ত করি এবং মু'তামাদ জৈনুদ্দিনকে তাঁর মালিকের কাছে (কাশ্মীরের শাহের কাছে) পাঠিয়ে দেই এই বার্তা নিয়ে যে, আমার কর্মকর্তারা যা দাবী করেছে তা পূরণ করতে তিনি নিজেকে যেন বাধ্য মনে না করেন, বরং তিনি আমার রাজকীয় আনুকূল্যের উপর আস্থা রেখে নির্ভয়ে ফিরে আসুন। অতঃপর এটা ছিল মাসের ১৭ তারিখ এবং ২৮দিন পার হবার পর রজব মাসের ১৫ তারিখ তিনি সিন্ধু নদীর তীরে আমার শিবিরে অবশ্যই এসে দেখা করেন।

আমার শিবিরের সামনের একটি পাহাড়ের পাদদেশে একটি উন্নত গ্রাম ছিল। সেটিকে লুণ্ঠন করার জন্য আমি একটি বাহিনী পাঠিয়ে দেই।^{৪৫} তারা যখন সেখানে পৌঁছয়, তখন সে স্থানের বিপুল সংখ্যক হিন্দু প্রতিরোধ করার জন্য সমবেত হয়, তবে আমার লোকেরা এগিয়ে গেলে তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার হয় এবং তারা তাদের বাড়ী-ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে পাহাড়ের দিকে পালিয়ে যায়। আর বিজয়ী সৈন্যরা তাদের পিছু ধাওয়া করে এবং অনেককে হত্যা করে। প্রচুর পরিমাণ শস্য ও সম্পদ লুটেরমাল হয়ে আমাদের হাতে আসে। এই গ্রামের সামনে আরো দুইটি বড় গ্রাম ছিল। এগুলোও লুণ্ঠিত হয় এবং বিপুল পরিমাণ পরিত্যক্ত মালামাল হাতে আসে। এইদিন রা-তৈমুর আহত হন।

মাসের ১৯ তারিখ আমি আবারো পথচলা শুরু করি এবং জম্মু নগরীর বিপরীত দিকে এসে পৌছি। সেখানে শিবির স্থাপন করি এবং আমার রাজকীয় তাঁবু ও চাঁদোয়া খাটানো হয়। এই দিনে আমি যে ৫ বা ৬ ক্রোশ পথ অতিক্রম করেছি তার পুরোটাই গিয়েছি একটি মার্জিত সুজলা-সুফলা রাজ্যের মধ্যদিয়ে। আমি এর কোথাও শুষ্ক ও খালি (পরিত্যক্ত) ভূমি দেখিনি এবং তাই আমি যেখানে শিবির স্থাপন করেছি, সেখানে আমার কোন লোককে তার অশ্ব বা উটের জন্য খড় খুঁজতে ময়দানে যেতে হয়নি, কারণ সেখানে তাঁবুগুলোর মাঝামাঝি স্থানে জন্তুগুলোকে খাওয়ানোর মত যথেষ্ট শস্য ও ঘাস ছিল। পরদিন মাসের ২০ তারিখ, রাতটা বিশ্রাম নেবার পর আমি জম্মু শহর আক্রমণ করার মনোভাব নিয়ে আবারো পথচলা শুরু করি। আমি সেই উপত্যকায় আসি, যেখানে ছিল জম্মুর নদীর উৎসস্থল। সেখানে আমি তাঁবু ফেলি। তবে আমি আমার সৈন্যবাহিনীকে নদী পার হয়ে একটি পাহাড়ের পাদদেশে, শহরের বামে এবং ডানদিকে মানু গ্রামে প্রেরণ করি। আমার বাহিনী যখন এইসব স্থানে অবস্থান নেয় তখন দুরাত্মা হিন্দুরা তাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে গ্রাম থেকে পাহাড়গুলোর শীর্ষে পাঠিয়ে দিয়ে নিজেদেরকে তাদের গ্রামে সুরক্ষিত করে তোলে। তাদের রাজা তার লড়াকু গেবর ও ব্যায়ামবীর (বলিষ্ঠদেহী) হিন্দুদের সাথে নিয়ে উপত্যকায় তার ঘাঁটিতে অবস্থান নেয়, যেখানে তারা শিয়ালের মত চিৎকার করছিল। আমি নির্দেশ দেই যে, কোন সৈন্যেরই পাহাড়গুলোর দিকে যাওয়ার দরকার নেই অথবা এই গেবরগুলোকেও কিছু করার দরকার নেই, বরং জম্মু শহর ও মানু গ্রাম আক্রমণ ও লুণ্ঠন করতে হবে। সেই অনুসারে আমার বাহিনী লুণ্ঠনে লেগে যায় এবং শস্য, সবধরনের মালমাল ও গবাদিপশুর এক বিশাল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আহরণ করে। আমি বিজয়ীর বেশে আমার মালপত্রের স্থানে ফিরে এসে আমার তাঁবুতে প্রবেশ করি এবং রাতটা আনন্দ ও বিশ্রামের মধ্যদিয়ে অতিবাহিত করি।

সকাল হলে ঢাক বাজতে থাকে। আমি বাছাই করা সুনির্দিষ্ট সৈন্যদেরকে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আমীরদের অধীনে ন্যস্ত করে তাঁদেরকে জঙ্গলে গিয়ে আত্মগোপন করতে বলি এবং ঢাক বাজাতে বাজাতে আমি পথচলা শুরু করি। যেসব হিন্দু ও গেবর আমি এসে পড়ায় ভয়ে পাহাড়গুলোর মধ্যে পালিয়ে গিয়েছিল তারা এই সময় পাহাড়গুলো থেকে বেড়া দেওয়া নিরাপদ স্থানে নেমে আসবে (আমি চলে গেছি মনে করে) এবং আমার লুকিয়ে থাকা সৈন্যরা তখন সেই কাফেরদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদেরকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলতে পারবে। এই নির্দেশকে কার্যকর করার জন্য সৈন্যরা গিয়ে নিজেদেরকে লুকিয়ে রাখে এবং আমি আমার অশ্বে আরোহণ করে জম্মু নদী অতিক্রম করে চার ক্রোশ পথ চলি। এই পুরো পথটাই গেছে চাষাবাদযোগ্য একটি সবুজ ও উর্বর এলাকার মধ্যদিয়ে। আমি চিনাব নদীর তীরে একটি চাষ করা ভূমিতে শিবির স্থাপন করি এবং চারপাশে সমস্ত মালপত্রসহ তাঁবু ফেলি। আমি যেসব আমীরকে

লুকায়িত অবস্থায় রেখে এসেছিলাম তাঁদের কাছ থেকে কিছু অশ্বারোহী দ্রুততার সাথে এসে আমাদের খবর দেয় যে, আমি চলে আসার পর জম্মুর রাজা এবং অন্যান্য পিশাচ (ঘৃণ্য অর্থে) গেবররা সম্ভরণে পাহাড়ের উপর থেকে নিচে নেমে আসে। তারা যখন সমতলে পৌঁছে আমীররা তাঁদের গোপনস্থান থেকে দ্রুতবেগে বের হয়ে সেই কাফেরদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং তাদের বহু সংখ্যককে হত্যা করেন। শত্রুদের কিছু সংখ্যক ক্রান্ত ও জখমপ্রাপ্ত হয়ে জঙ্গল ও বনে পালিয়ে যায়। দেশটির শাসক জম্মুর সেই রাজাকে তার ৫০জন রাও ও রাজপুতসহ বন্দী করেছেন আমীর শেখ নুরুদ্দীনের অধীনস্থ দৌলত তৈমুর তাওয়াচি, হোসেন মালিক কুচিন ও অন্যান্য তুমানরা। বন্দীদেরকে নিয়ে পুরো বাহিনী আসছে। ঈমানদার লোকদের দ্বারা মুসলমানদের ধর্মের শত্রুরা খতম হয়ে যাওয়ায় অথবা বন্দী হওয়ায় আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাই (শোকরিয়া আদায় করি)। একদিন আগেও তারা তাদের সংখ্যা ও জঙ্গলের ঘনত্ব এবং পাহাড়ের উচ্চতা নিয়ে গর্বোদ্ধত হয়ে যুদ্ধ করবে বলে শোর করে যাচ্ছিল এবং এখন তারা আল্লাহর রহমতে আমার হাতে বন্দী। আমি সাথে সাথে আদেশ দিলাম যে, সেই ৫০জন বন্দীকে শিকল দিয়ে বাঁধা হোক। জখমপ্রাপ্ত ও বন্দী জম্মুর সেই রাজার উপর যখন আমার চোখ পড়লো, তখন তার অন্তরে ভয় ঢুকে গেল এবং আমি যদি তার প্রাণ রক্ষা করি তাহলে সে মুসলমান হয়ে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা প্রদান করতে রাজি হয়ে গেল। আমি সাথে সাথে তাকে কালেমা শিখিয়ে দেয়ার আদেশ করলাম। সে তা পড়লো এবং মুসলমান হয়ে গেল। এইসব কাফেরের কাছে গরুর গোশত খাওয়া বা গরু হত্যা করার চেয়ে বড় অপরাধ ও ঘৃণার কাজ আর কিছু ছিল না, কিন্তু সে (রাজা) মুসলমানদের সাথে গরুর গোশত খেয়েছে। যখন এইভাবে সে ঈমানদারদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল, তখন আমি আমার শৈল্যবিদদেরকে তার ক্ষত সারানোর আদেশ দেই এবং তাকে একটি লম্বা টিলা পোশাক ও রাজকীয় আনুকূল্য দ্বারা সম্মানিত করি।

২৩শে জমাদিউল আখির আমি সেই স্থানেই অবস্থান করি এবং শাহজাদা পীর মোহাম্মদ, শাহজাদা পীর রুস্তম ও আমীর জাহান শাহ'র কাছ থেকে বার্তাবাহকরা আসে— তাঁদেরকে আমি কয়েকদিন আগে একটি বাহিনীসহ লাহোরে পাঠিয়েছিলাম। বার্তাবাহকরা আমার জন্য খবর নিয়ে আসে যে, আমি যে কাজের জন্য তাঁদেরকে পাঠিয়েছি সেই কাজ সম্পন্ন করার জন্য শাহজাদা ও আমীরগণ লাহোরে পৌঁছেছেন। নুসরাত খোখারের ভাই মালিক শাইখা খোখার দিল্লীর সুলতান মাহমুদের পক্ষে লাহোরের সাবেক প্রশাসক (গভর্নর) ছিলেন। আমি তার ভাই নুসরাত শাইখা খোখারকে পরাজিত করার পর তিনিই হিন্দুস্তানের জমিদার ও প্রশাসকদের মধ্যে প্রথম আমার সাথে সাক্ষাৎ এবং বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। আমার দিল্লী নগরী দখলের সময় থেকে যমুনার কিনার ধরে পথচলা পর্যন্ত তিনি আমার সান্নিধ্যেই ছিলেন। দোয়াবের মাঝামাঝি এসে পৌঁছলে তিনি লাহোরে তাঁর

বাড়ী ফিরে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তাঁর হাবভাবে আমি সবসময় কপটতার লক্ষণ বুঝতে পারতাম এবং আমি ভালো করে জানতাম যে, তিনি ঠেকায় পড়ে বশ্যতা স্বীকার করেছেন এবং তাঁর সেই প্রকাশ্য ঘোষণা মিথ্যা। এখনো পর্যন্ত তিনিই প্রথম আত্মসমর্পণকারী, আমি তাঁর প্রজাদের ব্যাপারে খুবই সহানুভূতিশীল ছিলাম, যখনই সেই রাজ্যের কোন জমিদার নিজেকে শাইখা খোখারের পোষ্য হিসাবে নিজের পরিচয় দিত, তখনই আমি তাকে আমার অনুসারীদের হামলা, ধ্বংস ও লুণ্ঠন থেকে রক্ষা করতাম। আমি তাঁকে চলে যাবার অনুমতি দেয়ার পর তিনি লাহোরের দিকে অগ্রসর হন। সেখানে পৌঁছে তিনি আমার আনুকূল্য ও দয়ার ফলশ্রুতিতে তাঁর সেবাপরায়ণ ও আত্মনিবেদিত থাকার যে দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল তা ভুলে যান। আমার সাথে সাক্ষাৎকালে তিনি যে ওয়াদা করেছিলেন তা রক্ষা করতে কেবল ব্যর্থই হননি, বরং মাওলানা আব্দুল্লাহ ও অন্যান্যের মত আমার অনুসারীদের একটি দল যখন সমরখন্দ থেকে আমার সাথে যোগ দেবার জন্য লাহোরের মধ্যদিয়ে আসছিলেন তখন তিনি তাঁদের প্রতি কোন মনোযোগই দেখাননি এবং একবারও জানতে চাননি, কি কারণে আপনারা আসছেন? আপনারা কোথেকে আসছেন? বা আপনারা কোথায় যাচ্ছেন? শাইখা খোখারের পক্ষত্যাগের বিষয়টি আমার কাছে পরিষ্কার এবং সেই অকৃতজ্ঞ লোকটাকে বন্দী এবং লাহোর নগরীর কাছ থেকে মুক্তিপণ সরূপ খাজনা আদায় করার জন্য আমি শাহজাদা ও আমীরদেরকে প্রেরণ করেছিলাম।

শাহজাদা ও আমীরগণ কর্তৃক প্রেরিত পত্রটি পাঠ করে আমি দেখতে পেলাম যে, আমার আদেশ কার্যকর করে তাঁরা লাহোরে গিয়েছেন এবং সেখানকার বাসিন্দাদের উপর মুক্তিপণের টাকা ধার্য করে দিয়েছেন। তাঁরা এই টাকা সংগ্রহে শাইখা খোখারকে শিথিলতা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করতে দেখেছেন এবং তাই আমার আদেশ কার্যকর করে তাঁরা তাঁকে বন্দী করেছেন। তাঁরা মুক্তিপণের পুরো টাকা সংগ্রহ করেছেন এবং এখন আমার সাথে যোগ দেবার জন্য আসছেন। তাঁদের প্রতিবেদনের জবাবে আমি লিখি যে, শাইখাকে তাঁর ওয়াদার ব্যাপারে যেহেতু মিথ্যাবাদী হিসাবে পাওয়া গেছে এবং শত্রুতাবাপন্ন কাজ করেছেন, তাই তাঁর রাজ্য লুণ্ঠন করা হোক এবং তাঁকে শেকলে বেঁধে আমার সামনে পাঠিয়ে দেয়া হোক। আমি বার্তাবাহকের হাতে এই আদেশ প্রেরণ করি।

পরদিন মাসের ২৪তারিখ, আমি চিনা^{১৬} নদী অতিক্রম করি এবং ৪ বা ৫ ক্রোশ পথচলার পর আমি একটি সবুজ প্রান্তরে তাঁবু ফেলি। এই সময় আজারবাইজান থেকে শাহজাদা মিরান শাহ'র পত্র নিয়ে (সব ভালোভাবে চলছে— এই খবর নিয়ে) কিছু বার্তাবাহক আসে। ২৫তারিখ আমি আবারো পথচলা শুরু করি। পথে একটি নদী পড়ে, আমি তা পার হই এবং তাঁবু ফেলি। এইদিন নদী পাড়ি দিতে গিয়ে কিছু অসুস্থ লোক ডুবে যায়, তাই আমি নির্দেশ দেই যে, অসুস্থ ও দুর্বল লোকদেরকে পার করানোর জন্য আমার নিজের অশ্ব ও উটগুলো ব্যবহার

করা হোক। সেইদিন আমার শিবিরের সবাই নদী অতিক্রম করে এবং একইদিন পারস্য থেকে বার্তাবাহকরা এসে উপস্থিত হয়।...

আমার স্বদেশে ফিরে আসার খবর সমরখন্দে ঘোষণা করে দেবার জন্য আমি কোষাধ্যক্ষ হিন্দু শাহকে প্রেরণ করি এবং শাহজাদা ও একটি আদেশনামা জারির মাধ্যমে সৈন্যবাহিনীর আমীরদেরকেও হিন্দুস্তানে আমি কেমনভাবে বড় বড় বিজয় অর্জন করেছি, কিভাবে সুলতানদের রাজধানী দিল্লী ও অন্যান্য নগরী, শহর ও নামকরা নগরদুর্গগুলো জয় করেছি, কিভাবে আল্লাহ'র রহমতে আমি সেই রাজ্য ও পার্বত্যাঞ্চল দখল করেছি এবং কিভাবে আমার লোকেরা বিশাল যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসাবে বেগুমার টাকা-কড়ি ও স্বর্ণ, রত্ন ও জিনিসপত্র, উচ্চ বংশজাত অশ্ব ও হাতি ও গবাদিপশু হস্তগত করেছে তা পর্যালোচনা করে দেখতে বলি।

অতঃপর আমরা এইভাবে ফিরে আসি এবং আমার স্বদেশে এই ফিরে আসার খবর রাজ্যের সব অংশে প্রচার করে দেবার জন্য বার্তাবাহকদের প্রেরণ করি, যাতে আমাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য রাজপুরুষরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরিয়ে আসতে পারেন। এরপর আমার মনে হল যে, বার্তাবাহকদেরকে না পাঠালেই ভালো হত এবং মালপত্র পেছনে ফেলে আমারই আগেভাগে যাওয়া উচিত। সে অনুসারে আমি আমার অশ্বে আরোহণ করে পথেই পড়ে এমন একটি নদী অতিক্রম করি। ২৭তারিখ আমি ৬ ক্রোশ ভ্রমণ করি এবং একটি জঙ্গলের ধারে শিবির স্থাপন করি। আমার অগ্রবর্তী দলের লোকেরা আমার কাছে খবর আনে যে, হাতের কাছেই একটি ঝোপ, যার ভিতরে একটি বড় বাঘ রয়েছে। আমি সেখানে পৌছলে আমার সাহসী অনুসারীরা ঝোপটিকে সবদিক থেকে ঘিরে ফেলে এবং আমীর শেখ নুরুদ্দিন দ্রুতগতিতে লাফিয়ে সামনে চলে গিয়ে জন্তুটিকে তরবারী দ্বারা আক্রমণ ও হত্যা করেন। আমি উচ্চকণ্ঠে সেই সাহসী ব্যক্তির কৃতকার্যতার প্রশংসা করি।

আমি শিকার থেকে ফিরে এলে শাহজাদা পীর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর, শাহজাদা রুমতম, আমীর সুলায়মান ও আমীর জাহান শাহ লাহোর থেকে প্রচুর সম্পদ ও সম্পত্তি নিয়ে ফিরে আসেন এবং তাঁদেরকে সবধরনের সম্মানের সাথে অভ্যর্থনা জানানো হয়। তাঁরা লাহোরে লুণ্ঠিত দ্রব্য হিসাবে যে টাকা, মালামাল ও অশ্বাদি পেয়েছিলেন তা আমার সামনে উপস্থিত করেন এবং আমি সেসব মালামাল ও অন্যান্য জিনিস আমীরগণ ও দরবারে সে সময় উপস্থিত পরামর্শদাতাদের মাঝে বন্টন করে দেই।

তৈমুর একটি দরবার বসান

একইদিন আমি একটি জমকালো দরবার বসানোর আয়োজন করার জন্য নির্দেশ দেই। ...আমীর ও অন্যান্যদেরকে অনেক পুরস্কার, টিলা পোশাক ও কটিবন্ধ, তরবারী ও তুণীর প্রদান করার পর আমি সৈন্যবাহিনীর ডান ও বাম পার্শ্বের দলগুলোকে সুনির্দিষ্টভাবে নির্দেশিত পথ ধরে স্বদেশের দিকে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দেই। আমার সাথে যোগ দিয়ে শিবিরে আমার সাক্ষী হওয়া হিন্দুস্তানের সাইয়্যিদ, ওলামা, জমিদার ও ভদ্রলোকগণ এবং স্থানীয় লোকজন সবাই উপহারাদি এবং আমার রাজকীয় উদারতার স্বাদ গ্রহণ করেন। এরপর আমি তাঁদের সবাইকে স্বদেশে ফিরে যাবার জন্য আদেশ জারি করি। হিন্দুস্তানের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি খিজর খানকে মুলতানের শাসনকর্তা সারাজ বন্দী করে রেখেছিলেন। কিন্তু তিনি কারাগার থেকে পালিয়ে যান এবং বাইয়ানার শাসক আহোদানের কাছে আশ্রয় নেন। এই শাসক ছিলেন একজন মুসলমান এবং সং ব্যক্তি। আমি যখন বিজয়ীর বেশে হিন্দুস্তানের মধ্যদিয়ে পথ চলছিলাম তখন খিজর খান বাইয়ানা থেকে আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য দ্রুতবেগে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। আমি তাঁকে সম্মান ও দয়ার সাথে অভ্যর্থনা জানাই এবং আমার আবাসে নিয়ে যাই। এই সময় আমি তাঁকে মুলতানের শাসক নিয়োগ করি এবং (অন্যান্য স্বাভাবিক সম্মানের নিদর্শন প্রদানের পর) তাঁকে আমি সেখানে পাঠিয়ে দেই।

গণ্ডার ইত্যাদী শিকার

মাসের ২৬তারিখ আমি আবারো পথচলা শুরু করি এবং চক্রোশ পথ চলার পর কাশ্মীরের ভূখণ্ডে জাভান গ্রামে এসে পৌঁছি। এখানে গণ্ডার ইত্যাদী শিকার করি।

কাশ্মীরের বিবরণ

এই পর্যায়ে আমি কাশ্মীর রাজ্য ও নগরী সম্পর্কে অবগত আছেন এমন ব্যক্তিদের কাছ থেকে খোঁজ-খবর নিই। তাঁদের কাছ থেকে জানতে পারি যে, কাশ্মীর একটি অতুলনীয় দেশ। দেশটির মাঝখানে নাঘাজ নামে একটি খুবই বড় ও জনবহুল নগরী রয়েছে। দেশটির শাসক সেখানেই বসবাস করেন। নগরীর দালানগুলো খুবই বড় বড় ও কাঠের তৈরী এবং সেগুলো চার বা পাঁচ তলা উঁচু। সেগুলো খুবই শক্ত এবং ৫শত বা ৭শত বছর পর্যন্ত টিকবে। নগরীর মাঝখান দিয়ে একটি বিশাল নদী বয়ে যাচ্ছে, যা বাগদাদের দজলা নদীর মত বড় এবং নগরীটি এই নদীর দুইপাড়ে গড়ে উঠেছে। এই নদীটির উৎসস্থল একটি হ্রদ এবং এটি এই কাশ্মীরের মধ্যেই, এর নাম বীরনাগ। এর বাসিন্দারা নদীটির অন্ততঃ ত্রিশটি স্থানের উপর সেতু তৈরী করেছে। এগুলো কাঠ, পাথর বা নৌকা দিয়ে তৈরী। সর্ববৃহৎ সাতটি সেতু রয়েছে নগরীর মধ্যেই এবং বাকীগুলো নগরীর আশেপাশে। নদীটি যখন কাশ্মীরের সীমানার বাইরে প্রবাহিত হয় তখন এটি যে নগরীর মধ্যদিয়ে যায় সেই নগরীর নামে এটির নামকরণ হয়। যেমন দানদানা নদী ও জামদ নদী। নদীটি মূলতানে গিয়ে চিনাবের সাথে মিলিত হয়েছে। সম্মিলিত সেই জলধারা মূলতানের নিচের দিকে প্রবাহিত হয়ে রাভী'র সাথে মিলিত হয়। বিয়াহ নদী অন্য আরেকটি স্থানের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হয়ে এসে তাদের সাথে মিলিত হয় এবং এই তিনটি জলধারা একত্রিত হয়ে তখন প্রতিবেশী উচএর সিঙ্কু নদীতে পতিত হয়। এই সবগুলো জলধারাকে বলে সিঙ্কু বা পাঞ্জাব^{৪৭} এবং এই নদী থাট্টার কাছে পারস্য উপসাগরে পতিত হয়েছে।

২৯শে জমাদিউল আখিরে আমি জাভান থেকে যাত্রা শুরু করি এবং ৫ ক্রোশ পথচলার পর দানদানা নদীর তীরে শিবির স্থাপন করি। সেখানে অনেকগুলো নৌকা সংগ্রহ করে একটি সেতু তৈরী করার জন্য আমি নির্দেশ দান করি। আমি আমীর শাহ মালিক ও জালালুল ইসলামকে সেতুর মাথায় গিয়ে তাঁদের অবস্থান নিয়ে সৈন্যবাহিনীর পারাপারের তত্ত্বাবধান করার নির্দেশ দেই। সব সৈন্য ও মালপত্র নিরাপদে পার হয়ে যাবার পর আমিও পার হই এবং শিবির স্থাপন করি।

পরদিন ১লা রজব, আমি ভারী মালপত্র কিছু সুনির্দিষ্ট আমীরের দায়িত্বে অর্পণ করি—যে আমীরগণ পেছন পেছন আমাদেরকে অনুসরণ করবেন। অতঃপর আমি আমার সাম্রাজ্যের রাজধানীর দিকে দ্রুতগতিতে পথচলার ইচ্ছা নিয়ে যাত্রা করি। সেইদিন আমি ২০ক্রোশ পথচলা সম্পন্ন করি এবং জু'দ পার্বত্যঞ্চলের সামবাস্ত গ্রামে বিশ্রাম করি। ২তারিখ আমি আবারো পথচলা শুরু করি এবং দিনের দেড় ঘড়ি ভ্রমণ করে আমি বুরুজা দুর্গের নিকটে পৌছি। সেখানে আমি এক ঘণ্টা থামি এবং যোহরের নামাজ (দুপুরের নামাজ) আদায় করে আবারো পথচলা শুরু করি। চোল-ই জালালীতে প্রবেশ করার পর আমি মাগরিবের নামাজ (সন্ধ্যার নামাজ) পর্যন্ত পথচলা অব্যাহত রাখি। আমি মরুভূমি থেকে বেরিয়ে এসে একটি হ্রদের কিনারে শিবির স্থাপন করি, হ্রদটি বর্ষাকালের বর্ষণের ফলে টইটম্বর হয়ে ছিল। ৩ তারিখ আমি আবারো শুরু করি এবং সকালের নাস্তার সময়ে আমি সিদ্ধুর পাড়ে পৌছি। আমি এই ভূখণ্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত পীর আলী সালান্দোজ ও অন্যান্য আমীরদেরকে এই নদীর উপর কাঠ ও নৌকা দিয়ে একটি শক্ত সেতু তৈরী করার জন্য আদেশ পাঠিয়েছিলাম। তাঁরা আমার আদেশ কার্যকর করেন এবং আমি সাথে সাথে সেতুটি পার হই। আমি আমীর আল্লাহদাদকে সৈন্যবাহিনী এবং যে মালপত্র আসছে তা পারাপারের জন্য সেতুর প্রহরায় নিয়োজিত থাকতে নির্দেশ দেই। আমি যোহরের নামাজ পর্যন্ত নদীর পাড়ে অবস্থান করি— যোহরের নামাজ আদায় করি সবার সাথে। এরপর আমি আবারো পথচলা শুরু করি এবং রাতের জন্য থামার পূর্ব পর্যন্ত ১০ ক্রোশ পথ চলি। ৩ তারিখ^{৪৮} আমি আবার চলা শুরু করি এবং দ্রুততার সাথে চলে আমি বানু দুর্গে পৌঁছে সেখানে শিবির স্থাপন করি।

টীকা

- ১) এটা তৈমুরের ভাষা। এরদ্বারা বিশ্বাসীদেরকে বুঝানো হয়েছে। যারা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস করে না তাদেরকে তিনি কাফের হিসাবে সম্বোধন করেছেন।
- ২) 'গাজী' হল ইসলামের সেইসব যোদ্ধা, যারা যুদ্ধে জয়ী হয়ে ফিরে আসে।
- ৩) এটা তৈমুরের নিজস্ব ভাবনা। আক্রান্ত না হলে বা বিনা কারণে অন্য ধর্মাবলম্বীদের উপর হামলা চালানো বা তাদেরকে হত্যা করা ইসলাম ধর্ম সমর্থন করে না।
- ৪) পবিত্র কোরআনের একেকটি বাক্যকে একেকটি আয়াত বলে।
- ৫) তৈমুর তাঁর উদ্দেশ্যের সুবিধার জন্য কোরআনের একটি খণ্ডিত বক্তব্য বেছে নিয়েছিলেন। এই বাক্যের পূর্বে বা পরে যা বলা হয়েছে তার দিকে তৈমুর দৃষ্টি দেননি। দৃষ্টি দিলে তিনি দেখতে পেতেন, সেখানে যুদ্ধের কথা বলার আগে-পরে কিছু কার্যকারণ ও শর্তের কথা বলা রয়েছে।
- ৬) বাধ্যতামূলক।
- ৭) শারারুদ্দিন ইয়াজ্জিদি লিখিত 'জাফর-নামা'য় লেখা হয়েছে 'উদাত্ত'।
- ৮) 'আল্লাহ আকবর' ধ্বনি।
- ৯) কোন্ মাস উল্লেখ নেই।
- ১০) চোল অর্থ মরুভূমি এবং জারাদ অর্থ অনুর্বর।
- ১১) পা রাখবার চৌকি।
- ১২) চ্যাপম্যানের ইংরেজী অনুবাদ এই পর্যন্ত।
- ১৩) 'জাফরনামা' গ্রন্থে বলা হয়েছে দু'ল চান। প্রকৃত অর্থে এটা হবে 'চান্দ'।
- ১৪) ধর্মাস্তরিত।
- ১৫) ইসলামের নামে এটা কেবলই তৈমুরের ব্যক্তিগত উন্মাদনা। যুদ্ধক্ষেত্রে ইসলামের যে নিয়মনীতি রয়েছে তা না মেনেই তৈমুর ইচ্ছামত রক্তের হোলি খেলা খেলেছেন। মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এবং চার খলিফা অনেক যুদ্ধ লড়েছেন কিন্তু এমন আশ্ফালন কখনো করেননি, এমন নির্মম উক্তিও কখনো করেননি।
- ১৬) তৈমুর যদিও বলেছেন যে, তিনি যা করেছেন তা কেবলই ধর্মযুদ্ধ, কিন্তু প্রকৃত অর্থে এটা ধর্মযুদ্ধ বলে মেনে নেয়া যায় না। কারণ ইসলাম ধর্মে এ ধরনের পাইকারি হত্যালীলা এবং লুণ্ঠন মোটেও সমর্থিত নয়। ইসলাম ধর্মে যুদ্ধের কিছু কঠোর বিধি-বিধান রয়েছে, যা সেনাপতি ও সৈন্যদেরকে কঠোরভাবে পালন করতে হয়। এইসব বিধি-বিধানে রয়েছে যে, হামলা করতে আসা ব্যক্তিকে ছাড়া আর কাউকে হত্যা করা যাবে না, যুদ্ধে গিয়ে কোন ধরনের বাড়ী-ঘর বা লোকজনকে লুণ্ঠন করা যাবে না, গাছ-পালা বা শস্যক্ষেত্র নষ্ট করা যাবে না ইত্যাদি।
- ১৭) সে সময় অনেক দুর্গ গড়ে তোলা হত পুরো শহরকে নিয়ে। অর্থাৎ দুর্গের চারপাশে যে শহর গড়ে উঠতো, সেই শহরকেও দুর্গের প্রাচীরের মধ্যে বেষ্টিত করে নেয়া হত, যাতে যুদ্ধকালে শহরটি শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়। এ ধরনের দুর্গকে 'নগরদুর্গ' বলা হত।

১৮) যেস্থান দিয়ে সহজে নদী পার হওয়া যায়।

১৯) শত্রু পক্ষের হাতি, ঘোড়ার অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত করার জন্য এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল।

২০) ‘জাফরনামা’য় রয়েছে, সুলতান মাহমুদের সাথে তাঁর নাতি সুলতান ফিরোজ শাহও যুদ্ধের ময়দানে এসেছিলেন।

২১) দিল্লী ছিল একটি নগরদুর্গ। পুরো নগরীটি প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল।

২২) সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী দিল্লীর বাসিন্দাদের পানির সমস্যা সমাধানের জন্য এই বিশাল পুকুরটি খনন করিয়েছিলেন। চতুষ্কোণ এই পুকুরটির প্রতিটি ধার ছিল ৬০০ মিটার।

২৩) ‘মধ্যযুগের ভারতীয় শহর’ গ্রন্থের (আনন্দ পাবলিসার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা) লেখক অনিরুদ্ধ রায় এর মতে, সুলতান-ইলতুতমিশ পানির সমস্যা মিটানোর জন্য ‘হাউজ-ই সামশি’ খনন করিয়েছিলেন এবং পরে ফিরোজ শাহ সেটি সংস্কার করেন। তবে ‘হাউজ-ই খাস’ খনন করেন আলাউদ্দিন খিলজী। যার কারণে প্রথম দিকে এটির নাম ছিল ‘হাউজ-ই আলাই’। তৈমুর এখানে সঠিক তথ্য দেননি।

২৪) এখানে উল্লেখ্য যে, ইনি গজনির সেই বিখ্যাত সুলতান মাহমুদ নন, বরং ইনি হচ্ছেন দিল্লীর সুলতান মুহম্মদ শাহএর কনিষ্ঠ পুত্র সুলতান মাহমুদ শাহ। সুলতান মুহম্মদ শাহ ছিলেন সুলতান ফিরোজ শাহএর পুত্র। সুলতান মুহম্মদ শাহ’র মৃত্যুর পর তাঁর দ্বিতীয় পুত্র সুলতান আলাউদ্দীন সিকান্দর শাহ মসনদে আরোহণ করেছিলেন। ক্ষমতারোহণের বৎসরই তিনি অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। হাউজে খাস এর পাশে পিতা ও পিতামহের কবরের পাশে তাঁর কবরও রয়েছে বলে ‘তবকাত-ই-আকবরী’ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। আলাউদ্দীন সিকান্দর শাহ’র মৃত্যুর পর তাঁর কনিষ্ঠপ্রাতা সুলতান মাহমুদ শাহকে রাজ্যের আমীরগণ সিংহাসনে বসান।

২৫) ‘তবকাত-ই-আকবরী’তে বলা হয়েছে, মালু খানের প্রকৃত নাম ইকবাল খান।

২৬) মুহম্মদ তুঘলক পুরনো দিল্লী, সিরি ও তুঘলকাবাদ এই তিনটি শহর মিলে একটি শহরে পরিণত করে এর নাম দিয়েছিলেন জাহানপনাহ। দেয়াল ঘেরা ছিল এই শহরসমষ্টি।

২৭) মালিক জৌনা বলতে এখানে কাকে বুঝানো হয়েছে তা স্পষ্ট নয়। তবে ‘হাজার সুতুন’ তৈরী করেছিলেন সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী। এটি ছিল দিল্লীর সুলতানদের সুরম্য প্রাসাদের একটি বিশাল দরবার কক্ষ। এর ছিল এক হাজার স্তম্ভ। কলিকাতা থেকে প্রকাশিত ‘মধ্যযুগের ভারতীয় শহর’ গ্রন্থে অনিরুদ্ধ রায় লিখেছেন, হাজার সুতুনের স্তম্ভগুলো ছিল কাঠের এবং ছাদও ছিল কাঠের।

২৮) খাজা নিজামউদ্দীন আহমদ রচিত ‘তবকাত-ই-আকবরী’ গ্রন্থে কেবল একটি কারণের কথাই বলা হয়েছে। সেটি হল, অর্থ আদায়কারী লোকদের কঠোরতার ফলে দৈবাৎ কতিপয় লোক অর্থ আদায়ে অসম্মতি জানায় এবং আদায়কারীদের কয়েকজনকে হত্যা করে। এর ফলে শক্তিমান তৈমুরের ক্রোধবহি প্রজ্জ্বলিত হয়, আর তিনি শহরের অধিবাসীগণকে হত্যা এবং বন্দী করার নির্দেশ দেন। দিনের মধ্যে অসংখ্য লোককে হত্যা এবং বন্দী করা হয়।

২৯) সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর আমলের।

৩০) গণলুপ্তন কালে আদৌ কি নির্দিষ্ট করে কাউকে রেহাই দেয়া সম্ভব ? তৈমুর শুধুমাত্র 'কাফেরদের' বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর কথা বললেও, তাঁর তরবারী দ্বারা মুসলমানরাও সমানভাবে কর্তিত হয়েছিলেন- এটা বলা যায়।

৩১) builders.

৩২) স্থানটির নাম ফিরোজ শাহ কোটলা।

৩৩) তৈমুরকে আমীর হিসাবে সম্বোধন করা হত।

৩৪) যমুনা ও হালিম নদীর মাঝখানের অঞ্চলকে দোয়াব অঞ্চল বলে। এটি দিল্লীর ৭ মাইল উত্তর-পশ্চিম দিকে।

৩৫) এর আগে 'মাওলা' বলা হয়েছে। তবে 'মাওলা'ই সঠিক হবে বলে মনে হয়।

৩৬) কৃষ্ণা নদী বা কালিনী।

৩৭) সম্ভবত: তৈমুর বাত দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাঁকে গরম মসল্লা, লবঙ্গ ইত্যাদির শৌক দেয়া হয়েছিল।

৩৮) এটা কুটিল নয়, কুপিলা হবার সম্ভাবনা বেশী। জাফরনামায় 'কুপিলা' উল্লেখ রয়েছে। হরদ্বারের পূর্বনাম হচ্ছে কুপিলা।

৩৯) হরদ্বারের কথা বলা হচ্ছে।

৪০) Miyapur.

৪১) 'জাফরনামা'য় বলা হয়েছে, যেসব শক্তিশালী সৈন্য ৩ বা ৪ শত গবাদিপশু ভাগে পেয়েছিল তারা যেন দুর্বলদের জন্য একাংশ ছেড়ে দেয়, যাতে সবাই বিজয়ের অংশীদার হয় এবং কেউ যেন খালি হাতে না থাকে।

৪২) ইসলামিক তারিখ শুরু হয় সন্ধ্যা থেকে, অর্থাৎ ইসলামিক ক্যালেন্ডারে তারিখ গণনায় রাত আগে আসে, দিন আসে পরে।

৪৩) ইসলামী রাষ্ট্রে বিধর্মীরা সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে বা দেশের জন্য যুদ্ধে যেতে বাধ্য ছিল না। এই মুক্তির বিনিময়ে তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে এক ধরনের কর নেয়া হত, সেটাই জিজিয়া কর। এই করের বিনিময়ে বিধর্মীদেরকে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সুরক্ষাও দেয়া হত।

৪৪) এর আগে এটাকে 'জাহান' বলা হয়েছে।

৪৫) এভাবে যত্রতত্র ইচ্ছেমত লুপ্তন করে বেড়ানো ইসলাম ধর্মে মোটেও সমর্থিত নয়, অথচ তৈমুর সবকিছুই করছিলেন ধর্মের দোহাই দিয়ে।

৪৬) সম্ভবতঃ চিনাব নদীর কথা বলা হয়েছে।

৪৭) পঞ্চ আব্ থেকে পাঞ্জাব। এর অর্থ পাঁচটি নদী।

৪৮) এর আগেও ৩ তারিখের কথা বলা হয়েছে, তাই এটা ৪ তারিখ হবে।